الْكَلِمَةُ الْحَاسِمَةُ السَّاهِرَةُ فِيْ الرَّدِّ عَلى الْبَرَيْلَوِيَّةِ الْمُجَسِّمَةِ الْفَاجِرَةِ

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে আনীত
কিছু আপত্তি ও তার খণ্ডন

ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান :
ওহাবী এবার মৌলবী আহমাদ রেযা খান

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা



ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান : ওহাবী এবার মৌলবী আহমাদ রেযা খান
লেখক: আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

১ম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশক; আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া
+8801676673946

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com; wafilife.com

প্রাপ্তিস্থান:

ঢাকা:
দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া মাদরাসা সংলগ্ন সালেহিয়া লাইব্রেরি।
+8801733965450

সিলেট বিভাগঃ
১. নোমানিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
২. লতিফিয়া লাইব্রেরী, কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
৩. সাইমুন লাইব্রেরী, সুবহানীঘাট, সিলেট।
৪. রাহবার লাইব্রেরী, সোবহানীঘাট, সিলেট।
৫. তাবাসসুম লাইব্রেরী, মৌলভীবাজার।
৬. নেহা লাইব্রেরী শমসের নগর রোড, মৌলভীবাজার।
৭. আলিফ লাইব্রেরী, কলেজ রোড, শ্রীমংগল।

মূল্য: ২৪০ টাকা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

আল্লামা মুহাম্মদ রশিদ রিদা সম্পাদিত মিশরের ঐতিহ্যবাহী আল-মানার ম্যাগাজিনে ১৯৩১ সালে 'তারজামাতুস সাইয়িদ আল-ইমাম আহমাদ বিন ইরফান আশ-শাহীদ মুজাদ্দিদুল ক্বারনিস সালিসি আশার' শিরোনামে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর একটি আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীতে স্বতন্ত্র বই আকারেও ছাপা হয়। এই বইতে আল্লামা নদভী বলেন,

وَأَرْجُوْ أَنْ يَّكُوْنَ السَّيِّدُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ عِرْفَانَ مُجَدِّدَ القَرْنِ المَاضِيْ ، وَأَنَا على ثِقَةٍ وَبَصِيْرَةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَمِنْهُ كَانَ عَصْرُ النَّهْضَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ فَضْلُ النَّشْأَةِ الحَاضِرَةِ

'আমি আশা করি সাইয়িদ ইমাম আহমাদ বিন ইরফান গত শতকের মুজাদ্দিদ হবেন। আমি ইনশাআল্লাহ দৃঢ় আস্থা ও সূক্ষ্মজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই আমি একথা বলছি। কেননা ইসলামের জাগরণের যুগ তাঁর থেকেই শুরু হয়েছিল এবং বর্তমান জামানার সব অর্জন তাঁরই উসিলায়।'

সূচিপত্র

ভূমিকা

الحَمْدُ للهِ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَبِفَضْلِه تَتَنَزَّلُ الخَيْرَاتُ وَالبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيْقِه تَتَحَقَّقُ المَقَاصِدُ وَالغَايَاتُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى حَبِيْبِه سَيِّدِ الكَائِنَاتِ ، وَآلِه وَصَحْبِه أَهْلِ الفَضْلِ وَالعِنَايَاتِ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَئِمَّتِنَا وَمَشَائِخِنَا مَصَابِيْحِ العِلْمِ وَالهِدَايَاتِ.

মৌলবী আশরাফুজ্জামানের ভিডিওর জবাব দেয়ার প্রস্তুতিকালে তার লিখিত "মুখোসের অন্তরালে" বইয়ের পিডিএফ আমার কাছে আসে। জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ তার আনীত অভিযোগ সমূহের জবাব ইতিপূর্বে কোনো না কোনো ভাবে দেয়া হয়েছে। তাকে মুনাফেকী থেকে বাঁচানোর জন্য জবাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মৌলবী আশরাফুজ্জামান বলেছেন, তার বই'র লিখিত রদ্দ করলেই তিনি সমাচারের জবাব দেয়া শুরু করবেন। কাজ্জাব আশরাফুজ্জামান দাবী করেছেন শত শত মানুষ নাকি সমাচারের জবাব দিচ্ছেন। আশা করি এবার তিনি শুরু করবেন। শায়খে ইন্নামা থেকে শুরু করে যারাই সমাচারের জবাব দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, সকলেই চরম মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছেন। মৌলবি আশরাফুজ্জামানের মূর্খতা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

সমাজে এক শ্রেণির মৌলবি আছে, যারা নানান ফতোয়া দিয়ে, নানান ফেতনা সৃষ্টি করে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে রাখে। মৌলবি আশরাফুজ্জামানরা গত শত বছর যাবত ঐ শ্রেণির মুল্লাদের নেতৃত্বে আছেন। তাদের ইমাম মৌলবি আহমাদ রেযা খান সাহেব এই বিষয়ে সর্বোত্তম উদাহরণ। সারা বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের রুহানী মুর্শিদ সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তার কটূক্তি ও অসত্য বয়ানকে কেন্দ্র করে

যে ফেতনার জন্ম তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা আজো অব্যাহত আছে। ওহাবী ও দেওবন্দীদেরকে ইজমালী মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে জন্ম দিয়েছেন ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ফেতনার। এখন তার অনুসারীরা যাকে তাকে যখন-তখন ওয়াহাবী ফতোয়া দেয়। দেখুন তার আজব ফতোয়া তার মালফুজাতে,

وہابی، قادیانی، دیوبندی ، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں ، کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا ، مسلم یا کافر اصلی یا مرتد ، انسان ہو یا حیوان ، محض باطل اور زنا خالص ہوگا اور اولاد ولد الزنا

'ওয়াহাবী দেওবন্দী মুরতাদ, ওদের পুরুষ মহিলার বিবাহ তামাম জাহানে যার সাথেই হোক, মুসলিম অথবা আসলি কাফির কিংবা মুরতাদ, ইনসান কিংবা হায়ওয়ান, বিবাহ বাতিল এবং খাটি জিনা হবে এবং সন্তানাদি জারজ হবে'।

পিছিয়ে নেই মৌলবি আশরাফুজ্জামানও। তিনিও ঘোষণা দিলেন, 'মাসলাকে আলা হযরতের বাইরে কেউ সুন্নী নয়'।

কথা একটাই, এই ফেতনাবাজদের রুখতেই হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া এই কাজ অসম্ভব। পাইকারী তাকফীর ও জাহালতের যেই ইমারত গড়ে তোলা হয়েছে গত শত বছর ধরে, এই ইমারত ভাংতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অন্তত ১৫/২০ বছরের প্রয়োজন।

আসুন দায়িত্ব-পালনে সবাই মনোযোগী হই।

আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউইয়র্ক
অক্টোবর ০১, ২০২১

ওয়াহাবী এখন সম্মানের লকব

মৌলবি আশরাফুজ্জামান প্রমাণ করেছেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এবং শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী দুজনেই ওয়াহাবী। বরং তারা ভারতে ওয়াহাবীবাদের সূচনা করেছেন।[1] সুতরাং এই সূত্রে মৌলবি আহমাদ রেযা খানের শায়খ আল্লামা শাহ আলে রাসূল মারহারাভীও ওহাবী। তাই নির্দ্ধিধায় বলা যায় ওয়াহাবী আরবে একটি নিন্দিত লকব হলেও ভারতে এই লকব এখন সম্মানের।

অশিক্ষিতদের পছন্দ - মৌলবি আহমাদ রেযা খান

রবিন্সনের[2] ইংরেজী দুটি বই রয়েছে: ১. The Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia এবং ২. Separatism Among Indian Muslims, the politics of the United Provinces, Muslims 1860 – 1923

উভয় বইতে মৌলবি আহমাদ রেযা খানের খুব প্রশংসা করা হয়েছে এবং বৃটিশমিত্র বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে। ২য় বইটিতে দাবী করা হয়েছে মৌলবি রেযা খান অশিক্ষিতদের পছন্দের

[1] আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী, *মুখোসের অন্তরালে*, পৃ. ৯, দলীল ১; পৃ .১০, দলীল ৩; পৃ. ১১-১২, দলীল ৬; পৃ. ১২, দলীল ৭ ও ৮।

[2] ফ্রান্সিস রবিন্সন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ক একজন অধ্যাপক। ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। Separatism Among Indian Muslims: The Politics of the United Provinces' Muslims 1860-1923 (1974), Atlas of the Islamic World since 1500 (1982), Varieties of South Asian Islam (1988), Islam and Muslim History in South Asia (2000) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

মানুষ ছিলেন, শিক্ষিত মানুষ তাকে পছন্দ করতেন না। আসলেই অশিক্ষিত, মূর্খ না হলে কি আর প্রমাণ দেয় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এবং শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী ওহাবী ছিলেন!!!

১ম বই'র ১৯৬ পৃষ্ঠায় ফ্রান্সিস রবিন্সন বলেন,
"The Actions of one learned man, the very influential Ahmad Rada Khan (1855 – 1921) of Bareilly, present our conclusion yet more clearly. He was the foremost supporter of unreformed Sufism in India and sent out to the qasbahas and villages of northern India hundreds of pupils who preached the intercession of saints and other questionable Islamic practices. At the same time, he supported the colonial government loudly and vigorously through World War 1 and through the Khilafat Movement, when he opposed Mahatma Gandhi, alliance with the nationalist movement, and non-cooperation with the British. Adherence to local, custom-centered Islam, and opposition to internationally conscious, reformed Islam, seemed to go hand in hand with support for colonial rule.
Finally, there are those Ulamas and Sufis whose very willingness to tolerate British rule, for a time at least, must be construed as a form of support."[3]
অর্থাৎ "বেরেলীর একজন বিজ্ঞ এবং খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আহমাদ রেযা খানের (১৮৫৫ – ১৯২১) কার্যকলাপ সমূহ আমাদের সিদ্ধান্তকে আরো স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করে। তিনি

[3] Francis Robinson, *The Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia*, Lahore: Ferozsons (pvt.) ltd., 2002, P. 196

ছিলেন ভারতের অসংশোধিত সুফীদের সর্বপ্রথম সমর্থক। তিনি দক্ষিণ ভারতের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে শত শত শিক্ষানবিশদেরকে পাঠিয়েছিলেন যারা সাধু-দরবেশগণের ওসীলাসহ ইসলামের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়সমূহ প্রচার করেছিল। সে সময়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও খেলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি (আহমাদ রেযা খান) ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি জোরালো ও দৃঢ় সমর্থন করেছিলেন, যখন তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে জোট বাঁধা মহাত্মা গান্ধীর বিরোধিতা করেছিলেন। স্থানীয় জনপদকেন্দ্রীক ইসলাম চর্চার প্রতি তার সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক সংস্কারকৃত ইসলামের প্রতি তার বিরুদ্ধাচরণ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তার ঘনিষ্ট সমর্থন হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল।

অবশেষে বৃটিশ শাসন মেনে নেয়ার প্রতি ঐ সকল উলামা ও সুফীদের প্রবল সম্মতি, অন্তত কিছু সময়ের জন্য, সে শাসনের প্রতি অবশ্যই তাদের সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হবে’।

২য় বই’র ৪২২ পৃষ্ঠায় মৌলবি আহমাদ রেযা খান সম্পর্কে ফ্রান্সিস রবিন্সন বলেন,

“He[4] was a consistent theological of both Firangi Mahal and the Deoband School, attacking ABDUL BARI, for instance, for acquiescing in the compromise reached with government over the Cawnpore Mosque. Nevertheless, his normal stance was one of support for government and he supported it throughout World War One, the Khilafat Movement, and in 1921 organized a conference of anti-non-co-operation ulama at Bareilly.

[4] আহমাদ রিযা খান।

He had considerable influence with the masses but was not favoured by the educated Muslims.” [5]

তিনি ছিলেন দেওবন্দ স্কুল এবং ফিরাঙ্গী মহলের একজন অবিচল ধর্মিতাত্ত্বিক, কঠোর সমালোচক। উদাহরণ স্বরূপ, কানপূর মাসজিদ ইস্যুতে সরকারের সাথে সমঝোতায় সম্মতি প্রকাশের কারণে আব্দুল বারীর বিরুদ্ধে তার অবস্থান গ্রহণ। এতদসত্ত্বেও তার স্বাভাবিক অবস্থান ছিল সরকারের জন্য সমর্থন স্বরূপ। এবং তিনি এটাকে (বৃটিশ সরকারকে) সমর্থন করেন পুরো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জুড়ে, খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে। ১৯২১ সালে তিনি বেরেলীতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উলামাদের non-co-operation (অসহযোগিতা) এর প্রতিবাদে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন। জনসাধারণের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল বটে, তবে শিক্ষিত মুসলমানদের সমর্থন তার সাথে ছিল না।

একই বইয়ের ২৬৮ পৃষ্ঠায় রবিন্সন বলেন ... pro-government fatwas of Ahmad Reza Khan অর্থাৎ গভর্নমেন্টের সাপোর্টে আহমাদ রেযা খানের ফতোয়াসমূহ।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা

সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে ভারতে ওয়াহাবীবাদের আমদানীকারক প্রমাণ করতে যেয়ে মৌলবী আশরাফুজ্জামান তার ইমাম মৌলবি আহমাদ রেযা খানের মাথাটাই কেটে ফেলেন। দেখুন,

[5] Francis Robinson, *Separatism Among Indian Muslims, the politics of the United Provinces, Muslims 1860 – 1923*, P. 422, Appendix III.

॥৩॥

"মুহাম্মদ জাকির হোসেন সিঃপ্রভাঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিঃ "কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা কুষ্টিয়া কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত ও প্রকৌ: মেহেদী হাসান লেকচার পাবলিকেশন্স লি: ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে আলিম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রণীত-

"আলিম পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয়পত্র)" গ্রন্থে ৮৬ নং পৃ. হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০) শিরোনামে লিখা হচ্ছে- "'শরীয়তুল্লাহ্ অল্প বয়সে মক্কায় গমন করেন। সেখানে প্রায় ২০ বছর অবস্থান করে ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। মক্কায় তিনি "ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা' শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।"[6]

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দেয়া এই রেফারেন্স থেকে প্রমাণিত হল শাহ ওয়ালিউল্লাহও (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) ছিলেন ওহাবী আন্দোলনের একজন নেতা। **শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র ওফাত ১৭৬২ সালে, আর সাইয়িদ আহমাদ শহীদ হজ্জে গেলেন ১৮২২ সালে। অথচ মৌলবি আশরাফুজ্জামান প্রমাণ দিলেন ১৮১৮ সালের আগে মক্কায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন!!!**

ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজীজ

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দলীলে শাহ ওয়ালি উল্লাহ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শাহ আব্দুল আজীজ ওয়াহাবী। দেখুন তার দলীল,

৬ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *মুখোসের অন্তরালে,* পৃষ্ঠা ১০।

॥১॥

"দিক দর্শন' প্রকাশনী লি: ২৬ বাংলা বাজার, আলী রেজা মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি.এস.এস. (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষের (২০১৩-১৪) সর্বজনাব মাহমুদুল মুর্শিদ (সুমন), মো: মাসুদ রানা, শাহনাজ পারভীন ও বসুদেব বিশ্বাস কর্তৃক রচিত এবং আর.সি.পাল সম্পাদিত (পরীক্ষা সহায়ক গ্রন্থ) 'রাষ্ট্র বিজ্ঞান' "ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন (১৭৫৭-১৯৪৭), পুস্তকের ১২১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন- প্রশ্ন-১০- ওয়াহাবী আন্দোলন কী?

উত্তরের প্রথম প্যারা ৪র্থ লাইন থেকে পড়ুন-"'অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত এ শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন পরবর্তীকালে তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আজীজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ (বেরলভি) এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পুত্র আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ বেরলভি প্রমুখের আদর্শ ও কর্মপন্থার সাথে আরবের ওয়াহাবের মিল ছিল বলে এ আন্দোলনের নাম "ওয়াহাবি আন্দোলন"। এর পরবর্তী প্যারায় লিখতেছেন- "উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।...ভারতে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১)। ১৮২০ সাল হতে সৈয়দ আহমদ আরবের ওয়াহাবিদের অনুকরণে ধর্মীয় সংস্কারের বাণী প্রচার শুরু করেন।... বহু মুসলিম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সৈয়দ আহমদ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে চারজন

খলিফা নিযুক্ত করেন। তার এ ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনই "ওয়াহাবী আন্দোলন" নামে পরিচিতি লাভ করে।"[7]

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দেয়া আরো কয়েকটি দলীল

।। ৬ ।।

"বিদ্যাসাগর কলেজ কলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় লিখিত, 'শ্রীধর পাবলিশার্স" ২০৯ বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৬ কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিম বঙ্গ সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন পরীক্ষার সহায়ক গ্রন্থ "স্বদেশ, সভ্যতা ও বিশ্ব' পৃঃ নং-৩৮০, ''ওয়াহাবি আন্দোলন'' শিরোনামে-

"'ওয়াহাবি আন্দোলন এর প্রকৃত নাম 'তারিখ-ই মহম্মদিয়া (তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া) অষ্টাদশ শতকে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহব (১৭০৩-১৭৮৯) নামে জনৈক ব্যক্তি আরব দেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় "ওয়াহাবী" এবং তার প্রচারিত ধর্মমত "ওয়াহাবি বাদ' নামে পরিচিত। ভারতে এই আন্দোলনের সুচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । দিল্লীর বিখ্যাত মুসলিম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) ও তার পুত্র আজিজ (১৭৪৬- ১৮২৩) এই সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।'

"শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এই আন্দোলনের সূচনা করলেও ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলির অধিবাসী "সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি (১৭৮৬-১৮৩১)।...তিনি মক্কায় তীর্থে যান এবং সেখানে ওয়াহাবি মতাদর্শের সঙ্গে সুপরিচিত হন। ১৮২২ সালে ভারতে ফিরে

[৭] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১০।

এসে তিনি ওয়াহাবি আদর্শে ভারতে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন।

পৃ নং-৩৮১ বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মির নিশার আলি বা তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১)। উনচল্লিশ বছর বয়সে মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহমদের সংগে পরিচিত হন ও ওয়াহাবি আদর্শ গ্রহণ করেন।"[8]

।। ৭ ।।

সমর কুমার মল্লিক ও প্রশান্ত দত্ত রচিত এবং ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, রাজেন্দ্র দেব রোড কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই- "ইতিহাস ও পরিবেশ চর্চা" পৃষ্ঠা নং ৪৭, শিরোনাম "তরীকা-ই মহম্মদিয়া' "ওয়াহাবি আন্দোলনের আসল নাম হল "তরিকা-ই মহম্মদিয়া (মহম্মদ নির্দেশিত পথ)। ওয়াহাবি শব্দটি আরবীয় সংস্কারক মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব' এর নাম থেকে এসেছে। অষ্টাদশ শতকে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি আরবে ইসলাম ধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রথম এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাকে অনুসরণ করে ভারতীয় ওয়াহাবি সম্প্রদায়। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে দিল্লীর মুসলিম সন্ত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটান। উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ বেরলবী ছিলেন ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত, যার নেতৃত্ব দেন মির নিসার আলি বা তিতুমির।"[9]

[৮] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

।। ৮ ।।

'"বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামিক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন রূপে ওয়াহাবি আন্দোলনের সুচনা হয়। ভারতে হাজি ওয়ালিউল্লাহ এর নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হলেও প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন "সৈয়দ আহমদ' বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা তিতুমীর বা মীর নিশার আলী। "

দিওয়ানে আজীজ ও শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী

মৌলবি আশরাফুজ্জামানদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র শেরে বাংলা আজীজুল হক। শেরে বাংলা সম্পর্কে মৌলবির বয়ান 'ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে দ্বীন-মিল্লাত, মুজাহিদে আজম আশেকে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আযীযুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী।'[10] মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার বইতে[11] একাধিক দলীলে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে ওহাবী

[১০] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২

[11] মৌলবি তার বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় সিরাজনগরের গালিবাজ মুরব্বীর একটি ভিডিও বক্তব্যের রেফারেন্স দিয়েছেন, অথচ ঐ ভিডিওতেই মুরব্বী শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলেছেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকে বলেছেন জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস আর মৌলবি আশরাফুজ্জামান তাঁদের উভয়কে ওহাবী প্রমাণ করলেন।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজীজ, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুমুল্লাহ এই মৌলবিদের প্রশংসার মোটেও মুখাপেক্ষী নন, আর তাদের দুর্নামী!!! ইমাম শাফী'র সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে গেল,

أعرِضْ عنِ الجاهلِ السفيهِ - فكلُّ ما قال فهو فيه

ما ضَرَّ بحرَ الفراتِ يومًا—إن خاضَ بعضُ الكلابِ فيه

সাব্যস্ত করেছেন। অথচ তার শেরে বাংলা শাহ আব্দুল আজীজ সম্পর্কে কি বলেছেন তার দিওয়ানে[12] দেখুন[13]

درمدح ملک العلماء ،فخر الکملاء ، سند المحدثین ، سید المفسرین ، زبدۃ العارفین ، فائق دوراں ، محسود اقراں ، محبوب خیر البریہ ، صاحب مقامات عالیہ، مظہر انوار الہیہ ، مصدر فیوضات قدسیہ ، منبع کمالات عجیبہ ، حضرت الحاج ، محدث مولنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ ربہ الباری

অলিকুলের সম্রাট, কামিল বান্দাদের গর্ব, মুহাদ্দিসদের সনদ, মুফাসসিরদের ইমাম, আরিফ বান্দাদের মূখ্য ব্যক্তি, যুগের শ্রেষ্ট, সমসাময়িকদের ঈর্ষার পাত্র, সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ট সত্তার প্রিয়ভাজন, উঁচু মর্যাদাসমূহে আসীন, আল্লাহ'র নূররাশির প্রকাশস্থল, পবিত্রাত্মাসমূহের ফয়জ ও বরকতরাজির উৎসস্থল, আশ্চর্যজনক গুণাবলীর প্রস্রবণ, হযরতুল হাজ্জ, মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী আলাইহি রাহমাতু রাব্বিহিল বারী'র প্রশংসায়

[১২] দিওয়ানে আজীজ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এই বইতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করা হয়েছে 'যে সিলসিলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী রয়েছে সেটা রাসূলে পাক ﷺএর ফয়ূযাত ও বারাকাত থেকে বঞ্চিত ও কর্তিত'। আবার একই বইতে সাইয়িদ সাহেবের সিলসিলার বহু বুজুর্গের প্রশংসাও করা হয়েছে। বাড়তি বিনোদন হিসাবে রয়েছে বার্মার সুন্দরী নারীদের দৈহিক সৌন্দর্যের অশ্লীল বর্ণনা। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

[13] আজিজুল হক, *দিওয়ানে আজীজ* (অনু: মাওলানা আব্দুল মান্নান), চট্টগ্রাম: সাগরিকা প্রিন্টার্স, ২০১২, পৃ. ৯৮ – ৯৯

দিওয়ান-ই আযীয ‖ ৯৯

পবিত্রাত্মাসমূহের ফয়য্ ও বরকতরাজির উৎসস্থল, আশ্চর্যজনক
গুণাবলীর প্রস্রবণ হযরতুল হাজ্জ মুহাদ্দিস মাওলানা শাহ্
আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহ্লভী
আলায়হি রাহমাতু রাব্বিহিল বারী'র প্রশংসায়

مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا মারহাবা- সদ মারহাবা- সদ মারহাবা- সদ মারহাবা-	بہر شاہ عبد العزیز دہلوی صد مرحبا বাহ্‌রে শা-হ্ 'আবদুল 'আযী-য দেহ্লভী সদ মারহাবা-

শত স্বাগতম, শত মুবারকবাদ, শত ধন্যবাদ, স্বাগতম।
শাহ্ আবদুল আযীয দেহ্লভীকে শত স্বাগতম।

صاحب تفسیر وفتوی بود آں فخر زماں সা-হেবে তাফসী-র্ ও ফাতওয়া- বূ-দ্ আ-ঁ ফখ্‌রে যামা-ঁ	نام تفسیر و فتاوی اش عزیزیہ بداں না-মে তাফসীর ও ফাতওয়া- আশ 'আযী-যিয়্যাহ্ বেদা-ঁ

তিনি ওই যুগের গর্ব ছিলেন তাফসীর ও ফাত্‌ওয়া গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর তাফসীর ও ফাত্‌ওয়া গ্রন্থের নাম যথাক্রমে- 'তাফসীরে আযীযী' ও 'ফতওয়া-ই আযীযিয়্যাহ্' -এটা ভালোভাবে জেনে রেখো।

پدر او ہم بد محدث شاہ ولی اللہ بداں পেদর উ- হাম্ বুদ মুহাদ্দিস শাহ্ ওলীয়্যুল্লা-হ্ বেদা-ঁ	صاحب کشف و کرامات صاحب تصنیف داں সা-হেবে কাশ্‌ফ ও কারা-মা-ত্ সা-হেবে তাস্‌নী-ফ্ দা-ঁ

তাঁর পিতাও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হলেন শাহ্ ওলীয়্যুল্লাহ্। এ কথাও জেনে রেখো।
এ কথাও জেনে রেখো যে, তিনিও কাশ্‌ফ ও কারামাতের অধিকারী এবং গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন।

پیشوائے اہلسنت بیگماں بودند شاں পে-শ্‌ওয়ায়ে- আহ্‌লে সুন্নাত বে-গুমা-ঁ বূ-দন্দ শা-ঁ	تربت شاں باغ جنت سازای رب جہاں তুরবতে শা-ঁ বা-গে জান্নাত সা-য্ আয় রব্বে জাহা-ঁ

নিঃসন্দেহে তিনি আহ্‌লে সুন্নাতের পেশোয়া।
হে জগতের মহান রব! তাঁর মাযার শরীফকে জান্নাতের বাগান করে দিন।

اندر آں دہلی بدانی روضۂ پرنور شاں আন্দর আ-ঁ দেহ্‌লী বদা-নী- রওযায়ে পুরনূ-রে শা-ঁ	مردماں پرفیض باشند دائما از ذات شاں মরদুমা-ঁ পুর ফয়য্ বা-শন্দ দা-ইমান্ আয্ যা-তে শা-ঁ

ওই দিল্লীতে তাঁর নূরানী মাযার শরীফ অবস্থিত -এ কথা জেনে রেখো!
তাঁর বরকতময় সত্তা থেকে মানুষ সর্বদা কল্যাণ লাভ করে ধন্য হচ্ছে।

نام ناظم گر تو خواہی شیر بنگالہ بداں না-মে না-যেম্ গরতু খা-হী- শে-রে বাঙ্গা-লাহ্ বেদা-ঁ	منکران اولیاء را سیف برّاں بیگماں মুনকেরা-নে আউলিয়া-রা- সায়ফে বোররা-ঁ বে-গুমা-

তুমি যদি এর রচয়িতার নাম জানতে চাও, তবে জানো, তিনি হলেন 'শেরে বাংলা'।
নিঃসন্দেহে ওলীগণের অস্বীকারকারীদের জন্য তিনি শানিত তরবারি।

মৌলবি আহমাদ রেযা খান ওয়াহাবী

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এবং শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী যদি ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা হন, মৌলবি আহমাদ রেযা খান অবশ্যই ওয়াহাবী হবেন। খান সাহেবের শায়খ হলেন আল্লামা শাহ আলে রাসূল মারহারাবী, শাহ আলে রাসূল মারহারাবী এবং আল্লামা ফজলে হক খায়েরাবাদীর শায়খ হলেন শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী, শায়খ আব্দুল আজীজের শায়খ হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী।

ফ্রেন্ডলি ফায়ারে মৌলবি আশরাফুজ্জামানের নাক কাটলো!!

এমন বেকুব জীবনে দেখিনি। শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভীকে ওয়াহাবী বানিয়ে মৌলবি আশরাফুজ্জামান টোটাল মাসলাকে আলা হজরতকে ওয়াহাবী বানিয়ে দিলেন। মৌলবি আশরাফুজ্জামানের মত মোল্লাকে দুধকলা খাইয়ে লালন করার ফল বেরলবীরা এভাবে ভোগ করবে কে জানতো আগে!!!! নিম্নে ৩টি কিতাবের স্ক্রিনশট দেখুন, যেখান রয়েছে মৌলবি আহমাদ রেযা খানের শায়খদের নাম ও সনদ।

- মৌলবি আহমাদ রেযা খান। তার শায়খ –
- আল্লামা শাহ আলে রাসূল মারহারাভী। তাঁর শায়খ –
- আল্লামা শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী। তাঁর শায়খ –
- আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী।

لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیھم رسولا من انفسھم یتلوا علیھم اٰیٰتہ و یزکیھم ویعلمھم الکتٰب و الحکمۃ

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی تقریباً تین سو تصانیف سے ماخوذ (۳۶۶۳) احادیث

وآثار اور (۵۵۵) افاداتِ رضویہ پر مشتمل علوم ومعارف کا گنج گرانمایہ

المختارات الرضویہ من الاحادیث النبویہ والاثار المرویہ

المعروف بہ

جامع الاحادیث

مع افادات

مجددِ اعظم **امام احمد رضا** محدث بریلوی قدس سرہ

جلد اول (مقدمہ)

تقدیم، ترتیب، تخریج، ترجمہ

مولانا محمد حنیف خاں رضوی بریلوی

صدر المدرسین جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف

نام کے ساتھ یہ کلمات تحریر فرمائے:۔

العمری نسباً ، الدھلوی وطناً، الاشعری عقیدۃً ،الصوفی طریقۃً الحنفی عملاً والشافعی تدریساً خادم التفسیر والحدیث والفقہ والعربیۃ والکلام ۔"

۲۳/شوال ۱۱۵۹ھ

اس تحریر کے نیچے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے یہ عبارت لکھی ہے کہ: "بیشک یہ تحریر بالا میرے والد محترم کے قلم کی لکھی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تصدیق ثبت ہے۔(۴۸)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

نام ونسب:۔ نام، عبدالعزیز۔ تاریخی نام، غلام حلیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خلف وجانشین ہیں۔

۲۵ ر رمضان المبارک ۱۱۵۹ھ میں ولادت ہوئی، حافظہ اور ذہانت خداداد تھی، قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ فارسی بھی پڑھ لی اور گیارہ برس کی عمر میں تعلیم کا انتظام ہوا اور پندرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراغت حاصل کرلی۔

آپ نے علوم عقلیہ تو والد ماجد کے بعض شاگردوں سے حاصل کئے لیکن حدیث وفقہ آپکو خاص طور سے والد ہی نے پڑھائے۔ ابھی آپکی عمر سترہ برس کی تھی کہ والد کا وصال ہوگیا۔ لہذا آخری کتابوں کی تکمیل شاہ ولی اللہ کے تلمیذ خاص مولوی محمد عاشق پھلتی سے کی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور علم وفضل میں بھی ممتاز لہذا مسند درس وخلافت آپ کے سپرد ہوئی۔

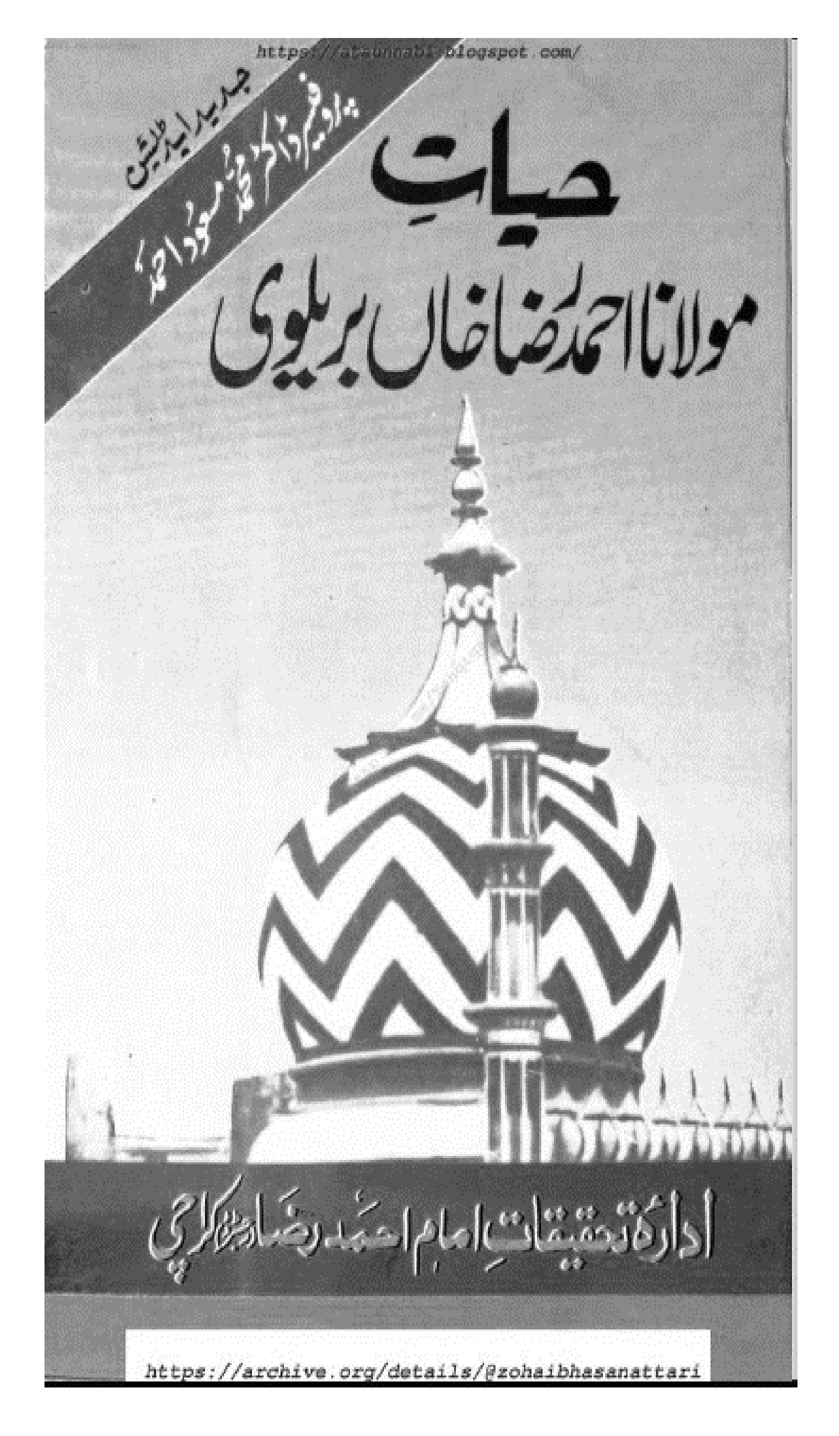
آپ کو تمام علوم عقلیہ میں کامل دستگاہ حاصل تھی، حافظہ بھی نہایت قوی تھا۔ تقریر معنی خیز وسحر انگیز ہوتی جسکی وجہ سے آپ مرجع خواص وعوام ہوگئے تھے۔ علو اسناد کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آتے اور آپکے حلقہ درس میں شرکت کرکے سند فراغ حاصل کرتے۔ آپکی ذات ستودہ صفات اپنے دور میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ آپکی ذات سے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث وتفسیر کا خوب چرچا ہوا، جلیل القدر علماء ومشائخ آپکے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔

بعض تلامذہ کے اسماء یہ ہیں۔

آپکے برادران مولانا شاہ رفیع الدین، مولانا شاہ عبدالقادر، مولانا شاہ عبدالغنی ۔اور مولانا منورالدین دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ شاہ آل رسول مارہروی (شیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی)

سید احمد خاں لکھتے ہیں:۔

اعلم العلماء، افضل الفضلاء، اکمل الکملاء، اعرف العرفاء، اشرف الافاضل، فخر الاماجد والاماثل، رشک سلف، داغ خلف، افضل المحدثین، اشرف علماء ربانیین، مولانا وبالفضل اولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ العزیز۔ ذات فیض سمات ان حضرت بابرکت کی فنون کسبی و وہبی اور مجموعہ فیض ظاہری وباطنی تھی۔ اگرچہ جمیع علوم مثل منطق وحکمت وہندسہ وہیئت کو خادم علوم دینی کا کرتمام ہمت وسراسر سعی کو تحقیق غوامض حدیث نبوی وتفسیر کلام الہی اور اعلاے اعلام شریعت مقدسہ حضرت رسالت پناہی میں مصروف فرماتے تھے، اور سوا اسکے جو کہ جلائے آئینہ باطن صیقل عرفان وایقان سے کمال کو پہنچی تھی، طالبان صافی نہاد کی ارشاد وتلقین کی طرف توجہ تمام تھی، اس پر بھی علوم عقلیہ میں سے کونسا علم تھا کہ اس میں یکتائی اور یک فنی نہ تھی۔ علم ان کے خانوادہ میں بطنا بعد بطن اور صلبا بعد صلب اس طرح سے چلا آتا ہے جیسے سلطنت سلاطین تموریہ کے خاندان میں۔ چودہ پندرہ برس کی عمر میں اپنے والد ماجد اشرف الاماجد عمدۂ علمائے حقیقت آگاہ ولی اللہ قدس سرہ کی خدمت میں تحصیل علوم عقلی ونقلی اور تکمیل کمالات باطنی سے فارغ ہوئے تھے۔ اس کے چندمدت کے بعد حضرت شاہ موصوف نے وفات پائی اور آپ کی ذات فائض البرکات سے مسند خلافت نے زینت وبہا اور وسادۂ ارشاد وہدایت نے رونق بے منتہا حاصل کی، کیوں کہ مولانا رفیع الدین اور مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہما والد ماجد کے روبرو صغیر سن رکھتے تھے، تمام علوم اور فیوض کو انہیں حضرت کی خدمت میں کسب کیا۔ علم حدیث وتفسیر بعد آپ کے تمام ہندوستان سے مفقود ہوگیا۔ علماء ہندوستان کے خوشہ چین اسی سرگروہ علماء کے خرمن کمال کے ہیں اور جمیع کملا اس دیار کے چاشنی گرفتہ اسی زبدۂ ارباب حقیقت کے مائدہ فضل وافضال کے۔ یہ آفت جو اس جزو زمان میں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہجہان آباد، حرسہا اللہ عن الشر والفساد، میں مثل ہوائے وبائی کے عام ہوگئی ہے کہ ہر عامی اپنے تئیں عالم اور ہر جاہل



نواب رام پور، کلب علی خاں نے مولانا عبدالحق خیرآبادی سے پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، مولانا بریلوی کی مولانا خیرآبادی سے ملاقات بھی ہوئی اور علمی گفتگو بھی مگر پڑھنے کی نوبت نہ آئی —

مولانا بریلوی کا سلسلۂ اسناد مندرجہ ذیل علمائے اعلام سے ملتا ہے :-

(۱) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ / ۱۷۶۲ء)
(۲) مولانا محمد عبدالعلی لکھنوی (م ۱۲۳۵ھ / ۱۸۲۰ء)
(۳) شیخ عابد السندی المدنی (م ـــــھ / ـــــء)

مولانا بریلوی ۱۲۹۴ھ / ۱۸۷۷ء میں شاہ آل رسول مارہروی (م ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۹ء) سے بیعت ہوئے اور اجازت وخلافت حاصل کی۔ مولانا بریلوی کو ۱۳ سے زیادہ سلاسل طریقت میں اجازت وخلافت حاصل تھی جس کا ذکر انھوں نے "الاجازۃ الملکیۃ" میں کیا ہے۔[1]

۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں مولانا بریلوی پہلی بار حج بیت اللہ اور زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضر ہوئے اور ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں دوسری بار حاضری دی۔ دونوں دفعہ حرمین طیبین میں جو آپ کی پذیرائی ہوئی اس سے دربار رسالت میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔[2]

---

[1] احمد رضا خاں: الاجازۃ الرضویہ لمبجل مکۃ البہیۃ - ص ۳۱۶ - ۳۱۸
[2] تفصیل کے لیے راقم کی تالیف: فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں (مطبوعہ لاہور) ملاحظہ کریں۔ مسعود

الاجازات المتينه لعلماء بكة و المدينة

مصنف :

حجة الاسلام العلام محمد حامد رضا خان

بن

الامام احمد رضا القادرى رحمهما الله

الناشر: المدينة العلمية

پی - او بکن نمبر : 18752

ایل میل : ilmia26@hotmail.com

کراتشی ،پاکستان

النسخـــــة الاولى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أَحَدٌ من لا احد له
وسند من لا سند له وافضل الصلاة واكمل السلام على سيد
الكرام وسند الانام منتهى سلاسل الانبياء العظام وعلى اله
وصحبه رواة علمه و وعاة ادبه وبعد فقد تفضل على المحدث
الفاضل العالم الكامل السيد النسيب الحسيب الاريب
مجمع الفضائل منبع الفواضل مولانا السيد الشيخ محمد
عبدالحي ابن الشيخ الكبير السيد عبد الكبير الكتاني الحسني
الادريسي الفاسي محدث الغرب بل محدث العجم والعرب
انشاء الرب وانا حل بالبلد الحرام لثلث بقين من ذى الحجة
سنة ثلث وعشرين بعد الالف وثلثمائة فاتاني وسمع مني
الحديث المسلسل بالاولية وهو اول حديث سمعه من هذا
العبد الضعيف كما سمعته من مولاى ومرشدى وسيدى
وسندى وكنزى وذخرى ليومي وغدى سيدنا الشاه ال رسول
الاحمدى رضى الله تعالىٰ عنه بالرضى السرمدى وهو اول
حديث سمعته' عن محدث الهند المشهور فى العرب والسند
مولانا الشاه عبدالعزيز الدهلوى وهو اول حديث سمعه منه
عن شيخه وابيه الشاه ولى الله الدهلوى وهواول حديث سمعه
منه وسلسلته' مشهورة وفى كتابه المسلسلات مسطورة

﴿١٧﴾

মিকয়াসে হানাফিয়্যাত ও তানকীদাতঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ, শাহ আব্দুল আজীজ কখনো শিয়া, কখনো ওয়াহাবী, কখনো সুন্নী

মৌলবি আশরাফুজ্জামান প্রথম ব্যক্তি নন, তার আগে মিকয়াসে হানাফিয়্যাত ও তানকীদাত নামক দুটি বইসহ তাদের অন্যান্য বইতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। দেখুন মিকয়াস,

"اچانک ارادہ حج آپ کو حجاز لے گیا، وہاں محمد بن عبد الوہاب نے دیکھا کہ بڑا ذی اثر عالم ہے ، شاہ صاحب سے بڑی محبت کا وطیرہ اختیار کیا ۔ اور اپنے عقائد سے شاہ صاحب کو ورغلانا شروع کیا ۔ داناؤں نے سچ کہا ہے

صحبت بد راہ تباہ مے کند دیگ سیاہ جامہ سیاہ مے کند

باپ کی صحبت نے شاہ صاحب کو رنگا ، اور حرمین شریفین تک رسائی کروادی، جس کے متعلق آپ نے کئی کتابیں لکھیں ، دیکھئے فیوض الحرمین وغیرہ ۔ نجدی کی صحبت کی تو رسائی بھی گئی ۔اور رنگ بھی جاتارہا ۔ جب واپس پہنچے تو حالت دگرگوں ہو چکی تھی ۔ اور اپنے والد ماجد کا عطیہ ولایت بھی کھو بیٹھے .... محمد بن عبدالوہاب کے عقیدہ کی چند کتا بیں بلاغ المبین وغیر ہ انبیا و اولیاء کی تو ہین میں شائع کیں ۔ مسلمانان ہند وستان کا چونکہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی سعی بلیغ سے حنفیت کارنگ پکا ہو چکا تھا ۔ اور شاہ عبدالرحیم صاحب کی صحبت سے لوگ متاثر تھے ۔ شاہ صاحب کی تحریر وتقریر مسلمانوں کو بے رنگ نہ کرسکی ۔ دہلی میں ایک شور بر پا ہو گیا کہ ولی اللہ وہابی ہو چکا ہے ۔ چنانچہ حیات طیبہ کے ص12 پر درج ہے کہ تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پر فتوی کفر صادر کئے تو شاہ صاحب کا جدی وعلمی وقار ہباء منثورا ہو گیا ۔ شاہ صاحب نے اپنے نئے مذہب وہابیت کی اشاعت کے واسطے اپنے خاندانی مذہب حنفی کے نام

کو بدل کر محمدی رکھ لیا ۔ چنانچہ چند متمول اشخاص شاہ صاحب کے معتقد بن گئے ۔ اور مذ ہبی آسانی اور آ زادی دیکھ کر پسند کر لیا ۔ اور شاہ صاحب کے ہروقت حفاظت میں مقید ہو گئے ، کیونکہ ہر مسلمان شاہ صاحب کے کلمات کو انبیا اللہ اور اولیا کرام کے بر خلاف برداشت نہ کر سکتا تھا ۔ اور چونکہ مسلمان فرق وہابیہ سے باخبر ہو چکے تھے ۔ اس واسطے عوام وخواص ان کو سوائے محمدی کے وہابی ہی کہتے تھے ۔ کیونکہ سوائے شاہ صاحب کے اور کوئی عالم شخص و ہابی نہ تھا ، لوگ اس وقت شاہ صاحب کو بڑا مذہبی مجرم سمجھ کر حملہ اور بھی ہو تے تھے ، لیکن حکومت اسلامی کے انصاف سے خائف تھے"[14]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকে নিয়ে আলোচনায় মিকয়াসে হানাফিয়্যাত, তারীখে ওয়াহাবিয়্যাহ অধ্যায়ে ৫৭৫ পৃষ্ঠার শেষ লাইন থেকে শুরু

ভাবানুবাদঃ

হঠাৎ করে হজ্জের নিয়তে তিনি (শাহ ওয়ালিউল্লাহ) হেজায চলে যান। সেখানে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব দেখলেন (শাহ সাহেব) বড় প্রভাবশালী আলিম। শাহ সাহেবের সাথে বড় মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং নিজ আকীদায় শাহ সাহেবকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেন। বিজ্ঞজনেরা সত্য বলেছেন,

‘খারাপ লোকের সংসর্গে ধ্বংস আসে,
কালো পাত্রে জামা কালো হয়ে যায়।’

বাপের সংস্পর্শ শাহ সাহেবকে রাংগিয়েছিল, হারামাই শরীফাইন পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিল, যে কারণে তিনি কয়েকটি কিতাব

[14] মাওলানা মুহাম্মাদ উমর সিদ্দীকী (বেরলভী), *মিকয়াসে হানাফিয়্যাত*, উর্দু, পুরাতন ছাপা ৫৭৫ – ৫৭৭; লাহোর: আল মিকয়াস পাবলিশার্স, ১৪২৬ হি., ২৮তম সংস্করণ, পৃ. ৫৬২ – ৫৬৪

লিখেছিলেন। দেখুন ফুয়ুজুল হারামাইন ইত্যাদি। নজদীর সূহবতে রাসাঈ ও রং সব যেতে শুরু করল। যখন ফেরত আসলেন তখন হালত বিগড়ে গিয়েছিল এবং আপন সম্মানিত পিতার দান বেলায়তও হারিয়ে বসেছেন। .... মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের আকীদার কিছু কিতাব বালাগুল মুবীন ইত্যাদী আম্বিয়া এবং আউলিয়াদের অপমানে তিনি পাবলিশ করেন। যেহেতু আলমগীর রাহিমাহুল্লাহ’র গভীর প্রচেষ্টায় ভারতের মুসলমানদের হানাফিয়াতের রং পাক্কা হয়ে গিয়েছিল, এবং শাহ আব্দুর রহীমের সুহবতে মানুষ প্রভাবিত ছিল, শাহ (ওয়ালিউল্লাহ) সাহেবের লেখনী এবং বয়ান মুসলমানদেরকে বেরং বানাতে পারেনি। দিল্লীতে শোরগোল পড়ে গেল ওয়ালিউল্লাহ ওয়াহাবী হয়ে গিয়েছেন। হায়াতে তাইয়িবাহ’র ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, তামাম উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমতে শাহ সাহেবকে কাফির ফতোয়া দিলে তার সব সম্মান ধুলিস্যাত হয়ে গেল। শাহ সাহেব তার নতুন মাযহাবের প্রচারের জন্য নিজ খান্দানী মাযহাব হানাফী পরিবর্তন করে মুহাম্মাদী রাখলেন। কিছু ধনী মানুষ তার অনুসারী হয়ে গেল এবং মাযহাবের আসানী ও আজাদী দেখে তা পছন্দ করল এবং শাহ ছাহেবের হেফাজতের জন্য সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োগ করল। কেননা মুসলমানগণ আল্লাহ’র আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে শাহ সাহেবের কথাবার্তা মুসলমানরা বরদাশত করতে পারতেন না এবং যেহেতু মুসলমানগণ ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে অবগত হয়ে গিয়েছিল সেহেতু মুহাম্মাদী সত্ত্বেও আম খাস সবাই উনাকে ওহাবী বলত। কেননা শাহ সাহেব ছাড়া আর কোন আলেম ওহাবী ছিল না, মানুষ তখন শাহ সাহেবকে মারাত্মক মাযহাবী অপরাধী মনে করে আক্রমণও করতে চেষ্টা করত কিন্তু ইসলামী হুকুমতের[15] ইনসাফের ব্যাপারে তাদের ভয় ছিল। [16]

[15] তাদের বিশ্বাসে বৃটিশ ভারত দারুল ইসলাম ছিল।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুমুল্লাহ: ইক্তেদার খানের মূল্যায়ন

মৌলবি আহমাদ ইয়ার খান নঈমীর ছেলে মৌলবি ইক্তেদার নঈমী তার তানকীদাত আলা মাত্বূআত বইতে লেখেন,

اہل علم حضرات فرماتے ہیں چار حضرات کی باتیں قابل تحقیق ہیں ، اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں 1. شاہ ولی اللہ صاحب 2. شاہ عبد العزیز صاحب 3. خواجہ حسن نظامی 4. تفسیر روح البیان ، یہ کبھی وہابیوں کی تائید میں ، کبھی شیعوں کی تائید میں ، کبھی اہل سنت کے ساتھ.

“আহলে ইলম হজরাত ফরমাতেহে চার হাজারাত কি বাতেঁ ক্বাবিলে তাহকীক হ্যেঁ, আকছার গ্বালাত্ব ছাবিত হোতি হ্যেঁ; ১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব, ২. শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব, ৩. খাজা হাসান নেজামী ৪. তাফসীরে রুহুল বায়ান। ইয়ে কভি ওয়াহাবিওঁ কি তায়িদ মে, কভি শীয়উ কি তায়িদ মে, কভি আহলে সুন্নাত কে সাথ”

অর্থাৎ, “হযরাত উলামায়ে কেরাম বলেন যে, চার হযরতের কথা তাহকীক করে গ্রহণ করতে হবে, কারণ অধিকাংশ সময় ভুল প্রমাণিত হয়। ১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ২. শাহ আব্দুল আজীজ ৩. খাজা হাসান নেজামী ৪. তাফসীরে রুহুল বয়ান। তারা কখনো ওহাবীর সাপোর্টে, কখনো শিয়াদের সাপোর্টে আবার কখনো আহলে সুন্নাতের সাথে।“[17] তবে তাদের মৌলবি আহমাদ রেযা

---

১৬ মাওলানা মুহাম্মাদ উমর সিদ্দীকী (বেরলভী), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৫- ৫৭৭

17 মৌলবি ইক্তেদার নঈমী, *তানকীদাত আলা মাত্বূআত*, পাকিস্তান: নঈমি কুতুবখানা, তাবি, পৃ ৭২

খানের জবানে কিংবা কলমে বিন্দু পরিমাণ ভুল হওয়া অসম্ভব।[18] যদিও তাদের বিশ্বাসে নবীদের ভুলত্রুটি হয়ে যায়।[19]
মৌলবি ইক্তেদার নঈমী আরো লেখেনঃ

ایسی ہی لا یعنی لغو و کذب باتوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور خواجہ حسن نظامی دہلوی کو معاشرۃ علمیہ میں مشکوک بنا دیا کہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ لوگ سنی ہیں یا شیعہ ، یا وہابی ، ان لوگوں نے اپنی کتب میں کوئی بات شیعہ نوازی میں کہ کر شیعہ فرقہ کو خوش کر دیا ، کوئی بات وہابیوں کی تائید میں کر دی ، اس کج روی کی بنا پر مشکوک لوگ اہل سنت کے لیے قابل سند نہیں رہے

অর্থাৎ, “এই ধরনের অনর্থক, ভুল ও মিথ্যা কথাবার্তা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী এবং খাজা হাসান নেজামী দেহলভীকে আলেম সমাজের মধ্যে মশকূক বা সন্দেহযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে যে, বুঝা যায় না উনারা সুন্নী না শিয়া না ওহাবী। তারা তাদের কিতাবে কখনো শিয়াবন্দনায় কিছু বলে শিয়াদেরকে খোশ করেছেন, কখনো বা ওহাবীদের সাপোর্টে কিছু লিখে দিয়েছেন। এই কারণে মশকূক ব্যক্তিবর্গ আহলে সুন্নাতের জন্য / আহলে সুন্নাতের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকতে পারেননি।“ [20]

---

18 এই কথা তাদের বহু কিতাবে আছে। আমি ইতিপূর্বে ফাজিলে বেরলভী সমাচারে তাদের ৩টি কিতাব দেখিয়েছি। ১. আহকামে শরীয়ত, উর্দু, ভুমিকা। ২. আনওয়ারে রেযা, উর্দু, পৃ.২৭০ ও ২৭১ ৩. ইয়াদে আলা হযরত, উর্দু, পৃ. ২৩ – ২৪।

19 , মৌলবি আহমাদ ইয়ারখান নঈমী, *তাফসীরে নূরুল ইরফান* (বাংলা) পৃ. ৭৯৮; উর্দু পৃ. ৪৮০
- মুহাম্মাদ আইনুল হুদা, *দুই ফাজিলের গোস্তাখী*, ঢাকা: আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া, ২০২১ খ্রি., পৃ. ৪৪

২০ মৌলবি ইক্তেদার নঈমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

অন্যত্র লেখেন,

حالانکہ عبد العزیز خود مشکوک شخصیت ہیں

“হালাঁকে আব্দুল আজীজ খোদ মশকূক শখছিয়্যত হ্যাঁ।” অর্থাৎ আব্দুল আজীজ নিজেই একজন মশকূক/ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিত্ব।[21]

বালাকোট আন্দোলন মোটেই ওহাবী আন্দোলন ছিল না

সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে সবার কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বালাকোট আন্দোলন মোটেই ওহাবী আন্দোলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে পাঠক সমীপে কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করছি:

১। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সর্বজনবিদিত সত্য হচ্ছে, ভারতের সালাফীরাই হচ্ছে ভারতের মূল ওয়াহাবী। বৃটিশ সরকারের আদেশে তারা নাম পরিবর্তন করে আহলে হাদিস হয়েছে।

২। ফতোয়ায়ে রেজভিয়াতে আছে ওয়াহাবীবাদের ১ম মুয়াল্লিম ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী এবং ২য় মুয়াল্লিম ইসমাইল দেহলভী।[22] ১ ও ২ এর মাঝখানে আর কোন নাম্বার নেই।

৩। সাইয়িদ আহমাদ শহীদ মুহাম্মাদিয়া তরীকার ইমাম এবং অন্য ৪ তরীকার খলীফা। ওয়াহাবীরা তরীকা তাসাউফে বিশ্বাস করে না।

[21] মৌলবি ইক্তেদার নঈমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

[22] মাওলানা আহমাদ রেজা খান, *ফতোয়ায়ে রেজভীয়া*, লাহোর: রেজা ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি., খ. ২৯, পৃ. ৬১৫, উমূর ইশরীন, নাম্বার ৮। (আলা হযরত নেটওয়ার্ক)

৪। প্রমাণিত সত্য সাইয়িদ সাহেবের জিহাদ আন্দোলন হজ্জে যাওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল।

৫। প্রমাণিত সত্য ওয়াহাবীরা বৃটিশ ও শিখদের মিত্র ছিল। আর সাইয়িদ সাহেবের আন্দোলন ছিল বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে।

৬। প্রমাণিত সত্য সাইয়িদ সাহেবের তরীকতের সিলসিলা এখনো বিদ্যমান এবং তাদের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে সালাফী নজদীদের বিরুদ্ধে।

৭। বৃটিশ লেখকদের বইতে সাইয়িদ সাহেবের বিরোধীতা করা হয়েছে। তিনি যদি আমদানীকারক হতেন, তাদের বইতে সাইয়িদ সাহেবের প্রশংসা করা হতো।

হাইলাইটস

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতামত অনুসারেই সায়্যিদ আহমদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ ওহাবী ছিলেন না। আমরা নির্বাচিত কয়েকজনের মতামত উল্লেখ করছি:

১. হাফিজুল হাদীস আল্লামা বশিরহাটি

‘হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের প্রতি ওহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে।’

‘প্রবঞ্চকেরা সুন্নতের বিরুদ্ধে জেদ করিয়া ও বেদয়াতের মমতায় মোহ হইয়া সুন্নতের অনুসরণকারি ও বেদয়াতের মুলোৎপাটনকারী সৈয়দ ছাহেবের দলের লোকদিগকে অহাবি বলিতে লগিল’।

‘প্রতারক ফাছাদি দল অবশ্য জেদে পড়িয়া সুন্নত জামায়াতকে অহাবি বলিয়া ও দীনদারগণকে বেদীন বলিয়া অহাবিদের অনুরূপ মতধারী হইয়াছে’।

২. ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি

“As the beliefs of the sect corresponded in a great degree to those of the Wahabis of Najd, those connected with the Jihad movement came to be called Indian Wahabis by British writers. This was a clever move for Abdul Wahhab and his followers, because of their excesses in the Hejaz, had incurred opprobrium in the Muslim world including India.”

‘যেহেতু নজদের ওহাবীদের সাথে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগুলি ব্যাপকভাবে মিলিত হয়েছিল, তাই জিহাদ আন্দোলনের সাথে জড়িতরা ব্রিটিশ লেখকদের দ্বারা ভারতীয় ওহাবী নামে পরিচিত হয়েছিল। আবদুল ওয়াহহাব এবং তার অনুসারীদের পক্ষে এটি একটি চতুর পদক্ষেপ ছিল, কারণ হেজাজে তাদের বাড়াবাড়ির কারণে ভারত সহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে তারা সমালোচিত হয়েছিল।’

৩. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী

فَتَعَصَّبَ أَعْدَاءُ اللهِ وَرَسُوْله فِي شَأْنِه وَشَأْنِ أَتْبَاعِه حَتَّى نَسَبُوْا طَرِيْقَتَه إِلى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ ، وَلَقَّبُوْهُمْ بِالوَهَّابِيَّةِ

‘যে কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনেরা তাঁর (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে উগ্রপন্থা অবলম্বন করে এমনকি তাঁর (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ)তরীকাকে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর দিকে সম্পর্কিত করে দেয় এবং তাঁকে (সাইয়িদ আহমাদ) ওয়াহাবী লকব দেয়।’

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ

‘রায় বেরেলীর এই আন্দোলনকেই ওহাবী আন্দোলনের নামে দুর্নাম করা হয়েছিল।’

৫. আল্লামা গোলাম আহমদ মোর্তজা

‘স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরত মাওলনা আসাদ মাদানীর কথায়- “ এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয় , সাড়ে সাতান্ন হাজার আলিম মৌলবী শাহাদতবরণ করেন। ” ঐ সাড়ে সাতান্ন হাজার মওলবীকে শিক্ষায় পণ্ডিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যাঁরা স্বাধীনতা বিপ্লবে প্রাণ দিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন, আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইতিহাসে ‘ওহাবী’।

‘শাহ সাহেবের শিষ্য আহমদ ব্রেলবী হজ হতে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজরা খুব চতুরতার সঙ্গে প্রচার করলো, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে, আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল । এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রসূলের বংশধরদের কবরগুলো ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে আর হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ হজ করতে গিয়ে মক্কা হতে সেই দলের এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর – বুজুর্গ ও পূর্ব পুরুষদের কবর ভাঙতে চায় । এই কথা ইংরেজদের টাকা খাওয়া কিছু দালাল শ্রেণীর লোক প্রচার করতে লাগলো। সাধারণ মানুষ বিশ্বাসও করলেন অনেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দু এমনকি যারা লেখক বা ঐতিহসিক তারা সকলেই ‘ওহাবী আন্দোলন কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নাজদের আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯১ খৃস্টাব্দে । অর্থাৎ ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ও শাহ হজ করতে যান তার অনেক আগেই ১৭৯১ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান।

আর তাঁর দলের প্রভাবও ঐ সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালে কম হয়ে যায় । অথচ শত শত নয় সহস্র দলিল পেশ করা যাবে যে ১৮২৩ এর আগেই সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায় । তবে হজ হতে ফিরে এসে আরও নতুন উদ্যমে জিহাদ আরম্ভ নয় বরং পুনঃ আরম্ভ করেন'।

৬. বিপ্লবী, সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত সত্যেন সেন

'দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই বৃটিশ বিরোধী জেহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনেই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আবদুল ওয়াহাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কোনও সংযোগ ছিলো না । তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।'

৭. জাস্টিস আব্দুল মওদুদ

'কিন্তু নেহাত মতলববাজিতে সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে "ওহাবী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং বিদেশী শাসক ইংরেজরা মুসলমানদের সশস্ত্র আন্দোলনকে লোকচক্ষে হেয় করার হীন মনোবৃত্তিতে "ওহাবী" নামাংকিত করেছে। আসলে হেজাজে আঠারো শতকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব যে পিউরিটানিকা বা অতিনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সঙ্গে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। পাক-ভারতীয় আন্দোলনকারীরা কখনও নিজেদের "ওহাবীদের" সংগে চিহ্নিত করেননি।

৮. ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার

"আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। '

৯. মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী

'দেহলভী আন্দোলনকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক নজদী আন্দোলনের সাথে একাকার করে থাকে, এর সাথে (দেহলভী আন্দোলনের সাথে)[23] একমত পোষণকারীরা শিকার হন না জানার, আর বিরোধীরা তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য এই তথ্যকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে।'

১০. মাসউদ আলম নদভী

'প্রপাগান্ডার ফলে হিন্দুস্থানে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ (১২০১–১২৪৬ হিজরি) এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ (১১৯৬–১২৪৬ হিঃ)র অনুসারীদেরকে ওহাবী উপাধিতে স্মরণ করা হয়েছে। অথচ নজদের তাওহীদবাদীদের সাথে উনাদের কোন সম্পর্ক ছিল না'।

"হযরত সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথীরা হজ্জ শেষ করেন ১২৩৭ হিজরিতে, এই সময় মক্কা মুকাররামায় নজদীদের নাম নিশানাও ছিল না। বরং মক্কা মুকাররামা'র শাসকেরা নজদীদের সাথে সামান্য জানাজানির সন্দেহ হলে ঐসব হাজীদেরকে খুব কষ্ট দিত। সুতরাং নজদী ওয়াহাবীদের

---

[২৩] মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

সাথে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র দেখা-সাক্ষাত এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার কাহিনী সত্যের অপলাপ নয় তো আর কি?"

১১. ড. মুহাম্মাদ ইনাম উল হক

'তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন:
ভারতের তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ । যদিও এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আরবের ওয়াহাবী মতবাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, তবুও বৃটিশ সরকার ইহাকে অনুরূপ নামে আখ্যায়িত করে ।
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য বিধায় এ আন্দোলনের নাম তারীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলন। আঠারো শতকে হেজাজে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সংস্কারমূলক কার্যাবলিকে ইংরেজরা ভারতবর্ষের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং এদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে আরবের ওহাবীদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের তরীকা-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে এদেশের মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদের ইংরেজরা ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত করে। হান্টারও তার গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওহাবি নাম দেন।
আসলে আঠারো শতকের শেষভাগে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব যে নীতিনিষ্ঠ (Puritanic) আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবি বলে পরিচয় দেননি । সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার অনুগামীরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেন না এবং তারা নিজেদেরকে সুন্নী অর্থাৎ

রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে আগ্রহী '

১২. অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ

'নেহায়েত সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে ওহাবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।'

১৩. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান

'The next person to bring the message of Islamic revivalism to Bengal was Sayyid Ahmad Shahid, who arrived at Calcutta in A.D. 1820 and again in 1822. His reform movement was known as Tariqah-i-Muhammadiyah (wrongly called Indian Wahhabism)'
'বাংলায় ইসলামের পুনরুজ্জীবনের বার্তা নিয়ে দ্বিতীয় যে মানুষটি এসেছিলেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ। তিনি কলকাতায় সর্বপ্রথম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং আবার ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেছিলেন। তার সংস্কার আন্দোলন তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া নামে পরিচিত ছিল (যাকে ভুলভাবে ভারতীয় ওহাবীবাদ বলা হয়)।'

১৪. প্রফেসর ড. আব্দুল করীম

'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে ইংরেজ শাসকরা ওয়াহাবী আন্দোলন রূপে অভিহিত করে।'

১৫. শ্রী রতন লাহিড়ী

'১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তার সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তারা এবং তাদের আন্দোলন সৈয়দ আহমদ বেরলবী রাহিমাহুল্লাহ'র অংকুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়।'

১৬. মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি

‘দেহলভী আন্দোলনকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক নজদী আন্দোলনের সাথে একাকার করে থাকে, এর সাথে (দেহলভী আন্দোলনের সাথে) একমত পোষণকারীরা শিকার হন না জানার, আর বিরোধীরা তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য এই তথ্যকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। ’

১৭. Muhammad Ismail

The militant movement for the rehabiliation of Islam in India in the early years of the 18th and 19th centuries was categorized as wahhabi by the British.

‘১৮শ ও ১৯ শতকের শুরুর দিকে ভারতে ইসলাম পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে যে সশস্ত্র আন্দোলন হয়েছিল, ব্রিটিশরা তাদেরকে ওয়াহহাবি আখ্যা দিয়েছিল।’

১৮. শেখ জেবুল আমিন দুলাল

কেউ কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাধারন মুসলমানদেরকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এ আন্দোলনকে ওয়াহহাবী (আন্দোলন বলে থাকেন) তথাকথিত ঐতিহাসিকগণও সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক, এই মারাত্মক ভুলটি করেছেন।

।।।১।।।

হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি ফুরফুরাবী: কারামতে আহমাদিয়া

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেবের প্রতি ওহাবি হইবার মিথ্যা অপবাদ

কেহ কেহ কোরআন হাদিছের ওয়াজকারি হওয়া, ফেকহ ও দ্বীনের কেতাবগুলি প্রচারিত হওয়া, লোকদিগের মজহাব ও দ্বীন সম্বন্ধে দৃঢ় হওয়া, জুমা, জামায়াত, তারাবিহ নামাজের অধিক

হওয়া, মছজিদ গুলির উন্নতি সাধন হওয়া, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে খতমতারাবিহ হওয়া, আম খাস লোকের পুত্র কন্যাদিগের হাফেজ হওয়া ও দীনি মস্লা মাসায়েল স্মরণ রাখা দেখিয়া জুলিয়া পুড়িয়া কাবাব হইয়া গেল। কেহ কেহ তাজিয়ার জন্য রোদন করিতে লাগিল। কেহ ছিওম, চাহারম, দশা, চল্লিশা, ছয় মাসিক ও বার্ষিক লোপ হওয়ার চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ নাচ, বাদ্য, ঢোল, তংপুরা, অপ্রকৃত হাল (জেজ্বা) হারাম হওয়ার কথা শুনিয়া লাফালাফি করিতে লগিল। কেহ কেহ গোরে আলোক দেওয়া, শাবে বরাতে প্রদীপ জালান, বাজি পোড়ান নিষিদ্ধ হওয়া শুনিয়া জুলিতে লাগিল। শবেবরাতে হালুয়া লোপ হওয়ার চিন্তায় কেহ কেহ অস্থির হইয়া পড়িল। কঙ্কন ছেহরা কাফেরী রীতি সপ্রমাণ হওয়ার জন্য কাহারও চক্ষে পরদা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ দৌল, চড়ক, বিজয়া পর্বের চিড়া মিঠাই নষ্ট হওয়ার চিন্তায় বক্ষে চপেটাঘাত করিতে লগিল। কোন বাসন্তী অনুষ্ঠানকারি হিন্দুদিগের প্রতিমা গুলির ন্যায় বসন্ত রঙের কাপড় পরিধান করা কোফরের চিহ্ন (মোশাবাহাত) শুনিয়া বিমর্ষ হইয়া গেল।

বেদয়াতি ও ফাছেকেরা নিজেদের নেতাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তখন সেই অশান্তি প্রিয় প্রতারকের দল যাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং লোকে যাহাদিগকে এক কড়া কড়ির তুল্য জ্ঞান করিত না, সময় সুযোগ বুঝিয়া পুনরায় উক্ত ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইল, উল্লিখিত দুষিত কার্যগুলি শিক্ষা দিতে লগিল। যেরূপ হজরত সৈয়দ সাহব দ্বীনকে সজ্জীবিত (তাজা) ও সুন্নতকে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারা বেদয়াত, শেরক ও কোফরের রীতিকে বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল প্রাচীন কাফেরদের ন্যায় বাপ দাদাদের কার্য্যকে উক্ত অহিত কার্যগুলির দলীল রূপে পেশ করিতে লগিল। লোকদিগকে স্বপ্ন, গল্প-কাহিনীর প্রতি আমল করাইতে মনোযোগী হইল ।

উক্ত প্রবঞ্চকেরা সুন্নতের বিরুদ্ধে জেদ করিয়া ও বেদয়াতের মমতায় মোহ হইয়া সুন্নতের অনুসরণকারি ও বেদয়াতের মুলোৎপাটনকারী সৈয়দ ছাহেবের দলের লোকদিগকে অহাবি বলিতে লগিল।

ইহাও তাহাদের উপর আসমানি বিপদ আপতিত হওয়ার কারণ হইয়াছিল। উপরোক্ত অপবাদ প্রয়োগ তাহাদের নিতান্ত অনভিজ্ঞতার চিহ্ন ছিল, কারণ সৈয়দ ছাহেবের দলের শত শত কেতাব বর্তমান আছে, তৎসমস্তের মধ্যে কেতাব সমূহ ব্যতীত অন্যান্য মজহাবের কেতাবের কোন কথাই উল্লিখিত হয় নাই।

সৈয়দ ছাহেবের দলের আলেমগণের মধ্যে সেহাহ্ সেত্তা, তফছির, হানাফি মজহাবের আকায়েদ, ফেকহ ও উসূলে ফেকহ শিক্ষা দেওয়া দিবারাত্র প্রচলিত রহিয়াছে। সেই আলেমগণই সেহাহ সেত্তা, সুন্নি মজহাবের তফছিরগুলি, আকায়েদ ও ফেকহের কেতাবগুলির মতন ও অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। উক্ত আলেমগণই কোরআণ মজিদ, হাদিছ শরিফ, ফেকহ ও তাছাওয়াফের কেতাবগুলির অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাদের দলের মধ্যে পরহেজগারি, খোদার উপর তাওয়াক্কোল করা, তাছাওয়ফ করা, তদনুযায়ী কোরআণ শরিফ পাঠ ও শিক্ষা দেওয়া, কোরআণ শরিফ কণ্ঠস্থ করা, বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করান, সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জেকর মোরাকাবা করা, দরুদ শরিফ দালাএলোল খয়রাত ও হেজবুল আ'জম, অধিক পরিমাণ তারাবিহ খতম করা, সমস্ত সুন্নত জারি করা ও বেদয়াত কার্য্যগুলি ত্যাগ করা যেরূপ ভাবে জারি রহিয়াছে, এরূপ অন্য কোন দলে নাই। ইহা সূর্যের ন্যায় সকলের নিকট প্রকাশ্য রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য আহলোল্লাহ, সুফি ও হানাফিদলের নিদর্শন বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি অহাবী হওয়ার চিহ্ন, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন?

সত্য কথা এই যে, অহাবিদের মজহাব প্রচীন কালে ছিল না, তাহাদের মজহাবের কোন কেতাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই যাহাতে উক্ত

মজহাবের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য লোকদিগের মুখে তাহাদের অবস্থা এতটুক বুঝা যায় যে, তাহারা শেরক হতে পাক থাকে, কিন্তু তাহারা এত হঠকারি যে নিজেদের দল ব্যতীত অন্য লোকদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে না, সমস্তকে মোশরেক বলিয়া থাকে, আর সমস্তের প্রতি কুধারণা পোষণ করিয়া থাকে, এমন কি মক্কা ও মদীনার লোকেরাও তাদের মতে মুসলমান নহে, বেদাতিদিগকে অতিরঞ্জিত ভাবে মোশরেক বলিয়া থাকে।

এই অহাবিদল সৈয়দ সাহেবের দলের ঘোর বিরোধী, কেননা সৈয়দ ছাহেব বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন এবং শেরক ও বেদয়াত এতদুভয়ের পার্থক্য খুব বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেরূপ তাহার দলের সমস্ত কেতাবে এই কথা প্রকাশ রহিয়াছে।

উপরোক্ত প্রতারক ফাছাদি দল অবশ্য জেদে পড়িয়া সুন্নত জামায়াতকে অহাবি বলিয়া ও দীনদারগণকে বেদীন বলিয়া অহাবিদের অনুরূপ মতধারী হইয়াছে।

উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদের দ্বিতীয় কারণ এই যে, লা-মজহাবিদিগের মধ্য হইতে একদল লোক সৈয়দ ছাহেবকে মন্দ বলিয়া থাকে, তকলিদ করা ও মুরিদ হওয়া নাজায়েজ বলিয়া থাকে । আর তাহাদের অন্য এক দল প্রবঞ্চনা করতঃ লোকদিগকে ধোঁকা দিবার উদ্দেশ্যে নিজদিগকে সৈয়দ ছাহেবের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করে, অথচ সৈয়দ ছাহেব এইরূপ লোকদিগকে নিজের জামায়াত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। মেয়াতো মাছায়েল প্রভৃতি কেতাবে উক্ত লা মজহাবিদের খুব রদ লেখা হইয়াছে। এই দুইদল লামজহাবি সুন্নতের পয়রবি করার দাবি করা সত্ত্বেও যখন অনভিজ্ঞতা বশতঃ অনেক সুন্নত বরং ওয়াজেবকে বেদয়াত বলিতে লগিল, তখন মোজাদ্দেদ ছাহেবের দলের (লোকেরা) তাহাদিগকে নিজেদের দল হইতে প্রকাশ্য ভাবে বাহির করিয়া দিলেন।[24]

[24] হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি ফুরফুরাবী, *কারামতে আহমাদিয়া* (মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাবীর অনুমোদনে), বশিরহাট: নবনূর প্রেস, তাবি, পৃ. ১৪ – ১৬

।।।২।।।
ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি[25] –উলেমা ইন পলিটিক্স

"After the martyrdom of Saiyid Ahmad, Sadiqpur established full control and, after that, extremist *ghairu taqlid*[26] became the creed of the movement, thus converting it into a sect. As the beliefs of the sect corresponded in a great degree to those of the Wahabis of Najd, those connected with the Jihad movement came to be called Indian Wahabis by British writers. This was a clever move for Abdul Wahhab and his followers, because of their excesses in the Hejaz, had incurred opprobrium in the Muslim world including India. In a short while many sincere theologians of the orthodox Hanafi school felt bound to challenge the views of the leaders of the Jihad Movement and British machinations induced some not so honest ulema to join the attack as well. The supporters of the movement were thus isolated and an important undertaking like Jihad was downgraded from being an Islamic endeavour to sectarian venture. The sole beneficiaries were the British who had abetted this

[25] ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশি (১৯০৩-১৯৮১ খ্রি.) ছিলেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল হিস্ট্রির অধ্যাপক। তিনি একইসাথে পাকিস্তানের একজন সংসদ সদস্য, গবেষক এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতেও তিনি কিছুকাল দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি চার খণ্ডে হিস্ট্রি অব পাকিস্তান সম্পাদনা করেছেন।

[২৬] লা-মাযহাবী গায়ের মুকাল্লিদ সালাফীবাদ

development. They could now take most severe steps against the so-called "Indian Wahabi Fanatics" without any reactions among other sectors of the Muslim society."[27]

"সাইয়েদ আহমদের শাহাদাতের পর, সাদিকপুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে চরমপন্থী লা-মাযহাবিয়ত আন্দোলনের আকীদা হয়ে ওঠে এবং এভাবে এটি একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যেহেতু নজদের ওহাবীদের সাথে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগুলি ব্যাপকভাবে মিলিত হয়েছিল, তাই জিহাদ আন্দোলনের সাথে জড়িতরা ব্রিটিশ লেখকদের দ্বারা ভারতীয় ওহাবী নামে পরিচিত হয়েছিল। আবদুল ওয়াহহাব এবং তার অনুসারীদের জন্য এটি একটি চতুর পদক্ষেপ ছিল, কারণ হেজাজে তাদের বাড়াবাড়ির কারণে ভারত সহ মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে তারা সমালোচিত হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীনপন্থী হানাফী মাযহাবের অনেক মুখলিস আলিম জিহাদ আন্দোলনের নেতাদের মতামতকে চ্যালেঞ্জ করতে বাধ্য হন। একইসাথে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র এমন কিছু ওলামাকেও আক্রমণে যোগ দিতে প্ররোচিত করে, যারা অতটা সৎ ছিলেন না। এইভাবে আন্দোলনের সমর্থকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জিহাদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে ইসলামী প্রচেষ্টা থেকে সাম্প্রদায়িক উদ্যোগে নামিয়ে আনা হয়। এর ফলে একমাত্র সুবিধাভোগী ছিল ব্রিটিশরাই, যারা নিজেরাই এমন পরিবর্তনে ইন্ধন যুগিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তারা এখন মুসলিম সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তথাকথিত "ভারতীয় ওহাবী ধর্মান্ধদের" বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে'।

[২৭] Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics*, Delhi: Renaissance Publishing House, 1985, p. 171

॥৩॥

সাইয়িদ আবূল হাসান আলী নদভী-
ইজা হাব্বাত রীহুল ঈমান

সাইয়িদ আবূল হাসান আলী নদভী[28] তাঁর বিভিন্ন কিতাবে জবাব দিয়েছেন মৌলবি আশরাফুজ্জামানের। আরবী ও উর্দুতে বালাকোট আন্দোলন এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদ সম্পর্কে তিনিই সর্বোচ্চ কিতাব রচনা করেছেন। আলী নদভীর জন্ম ও মৃত্যু রায়বেরেলিতেই এবং তিনিও একজন সাইয়িদ। তাঁর লিখিত প্রথম গ্রন্থ সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ।

সাইয়িদ আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ আরবী ভাষায় লিখিত তাঁর "ইজা হাব্বাত রীহুল ঈমান إِذَا هَبَّتْ رِيْحُ الإِيْمَان " কিতাবের ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠায় সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেন,

"فَأَحْيَا كَثِيْرًا مِّنَ السُّنَنِ الْمَمَاتَةِ ، وَأَمَاتَ عَظِيْمًا مِّنَ الإِشْرَاكِ وَالمُحْدَثَاتِ ، فَتَعَصَّبَ أَعْدَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِه فِي شَأْنِه وَشَأْنِ أَتْبَاعِه

[২৮] আবুল হাসান আলী আল হাসানী আন নাদভী (ডিসেম্বর ৫, ১৯১৩ - ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৯) তিনি বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক, লেখক এবং পন্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন ভাষায় ৫০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি "আলী মিয়াঁ" নামেও পরিচিত। তাঁর বাবার নাম আবদুল হাই এবং মাতার নাম খায়রুন্নেসা। তারঁ পিতা-মাতা উভয়েই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন। ১৯৩১ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সাইয়্যেদ রশিদ রেজা সম্পাদিত মিসরের আল মানার পত্রিকায় আলী মিয়াঁর সর্বপ্রথম প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল শহীদ আহমাদ বিন ইরফানের কর্ম ترجمة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مجدد القرن الثالث عشر। ১৯৩৮ সালে উর্দূতে "সীরাতে আহমাদ শহীদ"নামে তাঁর সর্বপ্রথম বই প্রকাশিত হয়।

حَتَّى نَسَبُوْا طَرِيْقَتَه إِلى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ ، وَلَقَّبُوْهُمْ بِالوَهَّابِيَّةِ"

'তিনি (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) অনেক মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেন এবং অনেক শিরক ও বেদাতের মূলোৎপাটন করেন। যে কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনেরা তাঁর (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে উগ্রপন্থা অবলম্বন করে এমনকি তাঁর (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ)তরীকাকে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর দিকে সম্পর্কিত করে দেয় এবং তাঁকে (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) ওয়াহাবী লকব দেয়'।[29]

॥৪॥

মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁঃ উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য

"ইংরেজ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যে কালে দিল্লী মারকায থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফতোয়া প্রকাশিত হয় সে সুত্রে তখন রায়বেরেলীর মারকায থেকেও বিপ্লবী আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। রায় বেরেলীর এই আন্দোলনকেই ওহাবী আন্দোলনের নামে দূর্নাম করা হয়েছিল''।[30]

"আমীর আলী খান যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ইংরেজদের কাছ থেকে টুংকের নবাবী গ্রহণে সাইয়িদ সাহেব সম্মত ছিলেন না। তিনি এর বিপরীত মতামত পেশ করেন। কিন্তু আমীর খান যখন

[29] সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইজা হাব্বাত রীহুল ঈমান*, কুয়েত: দারুল কলম, ১৯৭৪ খ্রি., পৃ. ১৭ ও ১৮

[৩০] মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ, *উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*(অনু: মাওলানা মুশতাক আহমদ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি. খ. ২, পৃ. ৪৮

সাইয়িদ সাহেবের রায় উপেক্ষো করে সন্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলে,ন সাইয়িদ সাহেব তখনই তাঁকে বিদায়ের প্রস্তাব দেন এবং সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই ১৮১৬ সালে তিনি দল পরিত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন।“[31]

।।। ৫ ।।।

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী: ভারত বর্ষে মুসলমানদের অবদান

“ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত সংস্কারক ও শায়খে তরীকত হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) প্রতি সাধারণ মানুষের আনাগোনা, ভক্তদের স্রোতপ্রবাহ ও গণজোয়ার ছিল অদ্বিতীয় ও অনন্য। তিনি আত্মশুদ্ধির মিশন ও হজযাত্রার উদ্দেশ্যে নগর ও জনপদ অতিক্রমকালীন পুরো এলাকার দু'একজন ব্যতীত সকল অধিবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাওবা ও বায়আতের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এলাহাবাদ, মির্জাপুর, বেনারস, গাজীপুর, আজীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় সামগ্রিকভাবে প্রায় কয়েক লাখ মুসলমান বায়আত ও তাওবা করেছিলেন। ধর্মের প্রতি জনগণের যে সার্বিক গুরুত্বানুধাবন ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়েছিল, তা নিম্নের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয়। উল্লেখ্য যে, বেনারস হাসপাতালের রোগীরা খবর পাঠান, “আমরা পীড়িত ও রুগ্ন হওয়াতে আপনার কাছে যেতে অক্ষম। তাই আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখানে আসতে পারলে আমরা বায়আত হতে আগ্রহী। অতঃপর তিনি কলকাতা কলকাতায় দুই মাস যাবত অবস্থান করেন। প্রত্যহ প্রায় হাজার লোক তাঁর বায়আত গ্রহণে ধন্য হত এবং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে। অধিকহারে বায়আত গ্রহণের সূচী ছিল নিম্নরূপঃ

[31] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১ - ১১২

সকাল হতে মধ্য রাত পর্যন্ত ভিড় থাকত নারী-পুরুষের। নামাজ, খাওয়া-দাওয়া ও মানবিক চাহিদার কার্যাবলী ব্যতীত আর কিছুই করার সুযোগ তাঁর হত না। মাথা পিছু বায়আত করানো তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই সকল বায়'আত প্রত্যাশী একটি বিশাল প্রান্তরে সমবেত হলে তিনি তাশরীফ নিতেন এবং সাত বা আটটি পাগড়ি খুলে তাঁদের হাতে প্রদান করতেন। ভক্তরা তা সশ্রদ্ধে টেনে নিতেন। তিনি উচ্চঃস্বরে আযানের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন। প্রত্যহ প্রায় সতের-আঠার বার এ আগমন ও কর্মধারা সুচারুরূপে পরিলক্ষিত হত।“[32]

“ধারাবাহিকভাবে এই পীর মাশায়েখদের কৃতিত্ব ও অবদানের বর্ণনা দেওয়া অতি দুষ্কর। তজ্জন্যে প্রয়োজন বিশাল গ্রন্থের। ভারতবর্ষে সমৃদ্ধ ও সুশীল প্রাণবন্ত সমাজ গঠনে (যা ঐ রাষ্ট্রের প্রধান নৈতিক ও চারিত্রিক সম্বল; নিঃস্বার্থ মানবতার সেবক ও সৎ শাসকদের প্রাণকেন্দ্র; এবং যার দরুন ভারত ভূ-খণ্ড প্রতি সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে সুযোগ্য মনীষীদের উপহার লাভ করে। সেই নিঃস্বার্থ সংস্কারকগণ ও চরিত্র বিনির্মাণকারীদের বিরাট অবদান রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর ঘটনাবলী বিশদ বিবরণ তরীকতের মাশায়েখ আলোচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অন্যতম পথপ্রদর্শক হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহঃ) এর ধর্মীয় ও চারিত্রিক প্রভাবের আলোচনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করছি। সাইয়্যেদ সাহেবের হজ যাত্রার আলোচনা পর্বে জনৈক ইতিহাসবিদ বলেন, একদা কলকাতায় এক মুহূর্তের মধ্যে মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। দোকানদাররা ইংরেজ সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়, 'আমরা বিনা দ্বিধায় সরকারের কর আদায় করে থাকি কিন্তু অধুনা আমাদের দোকান-পাট অচল। জনৈক

[32] আল্লামা আবূল হাসান আলী নদভী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনু: অধ্যাপক আ ফ ম খালিদ হোসেন), চট্টগ্রাম: সেন্টার ফর রিসার্চ অন কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৩৯-৪০

বুযুর্গ সদলবলে এই নগরে পদার্পন করলে শহর গ্রামের সমুদয় মানুষ তাঁর হাতে মুরীদ হয়ে যায় এবং প্রত্যহ মুরীদ হতে চলেছে। তারা যাবতীয় নেশাদায়ক দ্রব্যাদি থেকে তাওবা করছে, যার ফলশ্রুতিতে তারা এখন আমাদের মদ্য বিপনীর ধারে কাছেও যায় না।' তরীকতের মাশায়েখ, আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশক এবং তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার দরুন আপামর জনসাধারণ যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিলো এবং অসদাচরণ ও অপকর্ম থেকে বিরত ছিল, তা একমাত্র তাঁদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতারই ফসল। বিশ্বের কোনও প্রতিষ্ঠান, সংবিধান এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে যেমন প্রভাবান্বিত করতে পারে না, তেমনি স্থায়ী কোনো নৈতিকতা ও আইন-কানুনের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে না।[33]

একথা কারো অজানা নয় ওহাবীরা তরীকত, তাসাউফ মানে না। আর যারা তরীকত তাসাউফ মানে তাঁরা কখনো ওহাবী হতে পারে না। মিষ্টার হান্টারের নেকবখত সন্তান মুল্লাদের কমনসেন্সটাও মনে হয় বৃটিশ মিউজিয়ামে গ্লাসে বন্দী হয়ে রয়েছে।

।।। ৬ ।।।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা - ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ও পরবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ

ইতিহাসের ইতিহাস.

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসব মহা মনীষী অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও অবস্মরণীয় ভূমিকায় চির ভাস্কর হয়ে আছেন, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র.) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ও অন্যতম। তিনি

[33] আল্লামা আবূল হাসান আলী নদভী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

শুধুমাত্র ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেই নয় বরং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী দূত হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে রয়েছেন । প্রায় একশত বছর পরাধীনতার নাগপাশে বন্দিত্ব স্বীকার করার পর এই মহা বিপ্লবীর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতার আওয়াজ। ইনিই ছিলেন স্বাধীনতা সগ্রামের জন্মদাতা প্রথম মৃত্যুহীন প্রাণ।

এই মহা মনীষী হযরত আমলগীরের (র.) দেহাবসানের কয়েক বছর পূর্বে ১৭০৩ খৃস্টাব্দে এক পুণ্যময়ী রজনীতে দিল্লী নগরীর বিখ্যাত সাধক ও খোদাভক্ত শাহ আবদুর রহিমের (র.) সুযোগ্য সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আলমগীর (র.) তাঁর জন্মের পূর্বে প্রায়ই একজন তাপস শ্রেষ্ঠ, দুরন্ত প্রতাপ মনীষীর আগমনের প্রত্যাশায় দোয়া করতেন। তাঁর এই দোয়া বিশ্বস্রষ্টার দরবারে হয়েছিল । তাই আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন করতে, মানুষের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করতে তথা দ্বিধাবিভক্ত মতবাদে জর্জরিত ও সংকীর্ণতার অক্টোপাশে আবদ্ধ মৃতপ্রায় মানুষকে নতুন আলোর সন্ধান দিতেই জন্ম নিয়েছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ (র.)। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি আরবী সমস্ত পাঠ তথা দর্শন, ভূগোল, তর্ক ও ইলমে কালাম, তাসাউফ ও সুফি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র, হাদীস ও তফসীর প্রভৃতি নানা জাতীয় দুর্বোধ্য শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবই ভারতের মাটিতে প্রথম মনীষী, যিনি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাড়ে এগারশত বছর পর তদানীন্তন রাজকীয় ভাষা ফার্সীতে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে যান ।

সারা ভারতে পবিত্র কোরআন পঠিত হতো বটে কিন্তু আরবী পারদর্শী পণ্ডিতবৃন্দ ছাড়া সকলেই মহাগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বা অর্থাদি হতে বঞ্চিত ছিল। কুরআনের অন্য

ভাষায় অনুবাদ না করাও প্রতিবেশী, পরিবেশের অনুন্নত প্রভাবের ফল। শাহ ওলিউল্লাহ সর্ব ভাষায় মহাগ্রন্থের অনুবাদের রাস্তা নির্মাণ করলেন তাঁর ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতের শিক্ষিত মুসলমান প্রত্যেকেই ফারসী জানতেন। তাছাড়া তখন আইন আদালতে ফারসী সরকারি ভাষা ছিল, তাই শিক্ষিত মুসলমান সমাজে মহাগ্রন্থের মহানুবাদ বিদ্যুৎ ক্রিয়ার মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। হযরত ওলিউল্লাহ সাহেব নিজে একজন পীর বা আল্লাহ ভক্ত ফকির ছিলেন। তিনি তার প্রত্যেক ছেলেকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে শিষ্যভুক্ত করেছিলেন। তারা যথাক্রমে শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ, শাহ মাওলানা আবদুল কাদের, শাহ মাওলানা রফিউদ্দিন ও শাহ মাওলানা আবদুল গণি। আরও তার বাছাই করা ছাত্রদের মধ্যে শাহ মাওলানা ইসমাইল, যিনি তাঁর ভাইপো ছিলেন। **আর একজন পরশ পাথরতুল্য বীর ও পণ্ডিত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী।** তিনি তাঁর পুত্র আজিজ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। শাহ মাওলানা আবদুল হাই যিনি শাহ আবদুল আজিজের আত্মীয় বা প্রিয় জামাতা ছিলেন । এছাড়া তাঁর আরও বাছাই করা ছাত্র যারা দিল্লী হতে মাওলানা, মওলুবী বা মোল্লা মুফতি হয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মারাত্মক সংঘ তৈরি করলেন। যে প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা হতে এসব বিপ্লবী বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল সেই মাদরাসা দিল্লীর শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বেই দেখানো হয়েছে মোল্লাহ মাওলানা মুফতি বা প্রকৃত ফকিরদের প্রধান কাজ স্বজাতি – বিজাতি যেই হোক তার সঙ্গে লড়াই করা, যারা ইসলাম ধর্মে ক্ষতি করে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৩০ লক্ষ মুজাহিদ যোদ্ধা চারদিকে প্রচার কাজে লিপ্ত হলেন, জনমত গঠন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি, প্রথমত, মুসলমান জাতিকে পবিত্র কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করে ইংরেজকে তাড়িয়ে

দেওয়া। ইংরেজরা বড় চতুর, তারা তখনও যদিও সর্ব ভারতের সর্বময় কর্তা কিন্তু সরাসরি যেন লড়তে নারাজ। তাই ভারতের সরল শিখ জাতিকে মিথ্য প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । ফলস্বরূপ হাজারে হাজারে মুসলমানকে শহীদ হতে হলো । **স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরত মাওলনা আসাদ মাদানীর কথায়- " এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয় , সাড়ে সাতান্ন হাজার আলিম মৌলবী শাহাদতবরণ করেন।** ঐ সাড়ে সাতান্ন হাজার মওলবীকে শিক্ষায় পণ্ডিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যাঁরা স্বাধীনতা বিপ্লবে প্রাণ দিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন, আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইতিহাসে 'ওহাবী'। আসলে আরব দেশে নজদের অধিবাসী আবদুল ওহাব আরবীয়দের অনৈসলামিক কাজকর্ম ও চিন্তাধারা রোধ করার জন্য এবং মহাগ্রন্থ কোরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথে চালানোর জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে খুব হাঙ্গামা বা লড়াই হয়। আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করেন। ঐ সময় মক্কা-মদীনায় কবর পাকা করার নিয়ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং কবর পাকা করে বাঁধানো আভিজাত্যের পরিচয় বহন করত। আবদুল ওহাবের নির্দেশে বেশির ভাগ কবর ভেঙে মাটির কবরে পরিণত করা হয়। হযরত মুহাম্মদের (সা.) এবং তৎসংলগ্ন কবরগুলো সংরক্ষিত থাকে। তার যুক্তি ছিল মক্কা ও মদিনায় নির্দিষ্ট কবরস্থানগুলো মুসলিম জাতির এবং মক্কা ও মদীনাবাসীর নিকট খুব পবিত্র কিন্তু প্রত্যেকেই যদি কবর পাকা করা শুরু করেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে সীমিতস্থান পূর্ণ হয়ে যাবে ফলে মক্কা – মদীনাবাসী এবং মৃত হাজীর দল ঐ পবিত্র স্থানে সমাধিস্থ হওয়া হতে বঞ্চিত হবেন ।

যাই হোক আমাদের ভারতীয় হাজীরা ফিরে এসে ক্ষোভ, দুঃখ ও অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রকাশ করেন যে, রাসূলের বংশধরদের এবং

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বংশধরদের কবর সব শেষ করে দিয়েছে আরবের নতুন রাজা । এই সংবাদে সাধারণত ভারতীয় মুসলমানদের বেশির ভাগ লোকই দুঃখিত হন। শাহ ওলিউল্লার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল প্রথমেই মুসলমানদের কোরআন – হাদীস অনুযায়ী চলতে উৎসাহিত করেন আর অতিভক্তি, বাড়াবাড়ি, শেরক ও বিদআত হতে লোককে নিষেধ করেন । **শাহ সাহেবের শিষ্য আহমদ ব্রেলবী হজ হতে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজেরা খুব চতুরতার সঙ্গে প্রচার করলো, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল । এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রসূলের বংশধরদের কবরগুলো ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে আর হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ হজ করতে গিয়ে মক্কা হতে সেই দলের এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর – বুজুর্গ ও পূর্ব পুরুষদের কবর ভাঙতে চায় । এই কথা ইংরেজদের টাকা খাওয়া কিছু দালাল শ্রেণীর লোক প্রচার করতে লাগলো। সাধারণ মানুষ বিশ্বাসও করলেন অনেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দু এমনকি যারা লেখক বা ঐতিহাসিক তারা সকলেই 'ওহাবী আন্দোলন কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না । অথচ নাজদের আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯১ খৃস্টাব্দে । অর্থাৎ ১৮২৩ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ও শাহ হজ করতে যান তার অনেক আগেই ১৭৯১ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান । আর তাঁর দলের প্রভাবও ঐ সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালে কম হয়ে যায় । অথচ শত শত নয় সহস্র দলিল পেশ করা যাবে যে ১৮২৩ এর আগেই সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায় । তবে হজ হতে ফিরে এসে আরও নতুন উদ্যমে জিহাদ আরম্ভ নয় বরং পুনঃ আরম্ভ করেন ।**

প্রকৃত প্রতিভাধর অনেক ঐতিহাসিক লেখক এমন গবেষণামূলক বই লিখেছেন এবং লেখার ওপর ডক্টরেট পেয়েছেন তাঁরা মুসলমানদের এই আন্দোলনকে নানা নামে ভাগ করেছেন যেমন ওহাবী, তাঐউনি, মুহম্মদী, ফারাজী, পাটনা স্কুল দল এবং আহলে হাদিস প্রভৃতি। এগুলো ঠিক আন্দোলনের নাম নয়। সারা বিশ্বে যেকোন ব্যক্তি যেদিন ইসলাম অনুযায়ী নিজে চলেন এবং অপরকে চালানোর ব্রত গ্রহণ করাবেন আর প্রত্যেক কাজকর্মকে কোরআন আর হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাই করবেন তাদের রূপ সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম হবে, কিঞ্চিৎ যদি পার্থক্য পাওয়াই যায়, তা উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং নজদের ওহাব প্রতিষ্ঠিত কোন ওহাবী বলে দল নেই আর তাঁদের সঙ্গে ভারতের মুসলিম বিপ্লবের কাজেকর্মে মিল থাকতে পারে কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল না।

১৮২০ খৃস্টাব্দে কলকাতা আসার পথে আহমদ ব্রেলবী পাটনায় পৌছে বহু মুসলমানকে মুরীদ বা শিষ্য করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করে দেন এবং পাটনা কেন্দ্রের ভার বিপ্লবী মাওলানা বিলায়েৎ আলীকে ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন আর ভারতের মস্তক বঙ্গদেশের কলিকাতায় এসে পৌছান। কলকাতা কেন্দ্রকে মজবুত করে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাতে পারলেই সারা ভারতে ইংরেজ মার খাবে এই ছিল তার ধারণা। কলকাতার বড় মসজিদের নাম তখন ছিল কিতাবুদ্দিনের মসজিদ , ওখানেই এসে উঠলেন এবং বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ – আলোচনা করলেন । (দ্র. শহীদ তীতুমীর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা ২য় প্রকাশ পৃ. ৪২)

এখানে পীর বা ফকির আহমাদ সাহেব একটানা তিন মাস থাকেন এবং বহু লোককে মুরীদ করেন তাঁর ঐ শিষ্যগুলোই পরে আল্লাগত প্রাণ ধর্মযোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন । সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক আসতো আর ঐ মসজিদে এলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের তালিম পেত, নিত বা শুনতো । অতএব বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ১৮২০ এ পাটনায়, ১৮২১ এ কলকাতায় এবং ১৮২২ খৃ. ভারতের মূল মূল স্থানে বিপ্লবের বুনিয়াদ দিয়ে ১৮২৩ সালে তিনি আরবে গিয়েছিলেন হজ করতে। হজ হতে ফিরে এসে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে (আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে) জিহাদের ফতোয়া দেন ।[34]

।।। ৭ ।।।

ঈমান যখন জাগলো – আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী

“পুরো সফরটাই পথচারী মুসাফিরদের খিদমত করতে করতে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় বিরামহীন গতিতে পথ চলেছেন। চলতে চলতে তাঁর পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। অবশেষে এভাবেই কয়েকদিন পর তিনি দিল্লী পৌঁছেন এবং হযরত শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহর খেদমতে উপস্থিত হন। সৈয়দ সাহেবের বুযুর্গদের সাথে বহু আগে থেকেই রুহানী ও জ্ঞানগত সম্পর্ক ছিলো। সৈয়দ সাহেবকে পেয়ে প্রথমে মুসাফাহা (করমর্দন), কুলাকুলি এবং পারস্পরিক পরিচয়ের পর তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর তাঁকে আপন ভাই শাহ আব্দুল কাদির রাহিমাহুল্লাহ’র নিকট অবস্থান করার ব্যবস্থা করেন।

[34] গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *ইতিহাসের ইতিহাস*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০২১ খ্রি. পৃ. ২৫৩-২৫৬

হযরত শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ এবং শাহ আব্দুল কাদির রাহিমাহুল্লাহ’র সাহচর্য ও খেদমতে থেকে তিনি এরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং সেই সমস্ত উচ্চতর মাক্বাম মাকাম সমূহ হাসিল করেন যা বড় বড় মাশায়েখে কেরামের বিরাট রিয়াযত ও মুজাহাদা দ্বারা হাসিল হয়ে থাকে। **কিছু কাল পর শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে খিলাফত ও এজাযত নিয়ে তিনি নিজের জন্মস্থান রায়বেরেলি ফিরে আসেন।**[35]

।।। ৮ ।।।

বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা- বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি বিপ্লবী, সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত সত্যেন সেন[36]“”

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

[35] আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী, *ঈমান যখন জাগলো,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১৫

[36] সত্যেন সেন (২৮ মার্চ, ১৯০৭-৫ জানুয়ারি, ১৯৮১) হলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ উদীচী সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি বিপ্লবী, সাহিত্যিক এবং শ্রমিক-সংগঠক। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যুক্ত হন বিপ্লবী দল যুগান্তরের সাথে। ছাত্র অবস্থায় ১৯৩১ সালে তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্রথম কারাবরণ করতে বাধ্য হন। বহরমপুর বন্দি ক্যাম্পে থেকেই শুরু হয় তার জেলজীবন। এ সময় তিনি ৩ মাস জেলে ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বার গ্রেফতার হন। এ সময় তার ৬ বছর জেল হয়। সত্যেন সেন ১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পান। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৮০৩ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। ভারতের রাজধানী-দিল্লী শহর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসে গেল, আসলে এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহুদিন আগে থেকেই ভারতের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা তাকে এই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। যাদের দেখবার মত চোখ ছিল, তারা দেখতেও পাচ্ছিলেন যে, তার সর্বদেহে ক্ষয়রোগের লক্ষণগুলি ফুটে উঠছে। এ এক বিরাট মহীরুহ, যার ভেতরকার সমস্ত সার পদার্থ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তা হলেও সাধারণের দৃষ্টির সামনে এতদিন সে তার প্রভূত্বব্যঞ্জক মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, অবশেষে সেই মহীরুহের পতন ঘটল। চমকিত হয়ে উঠল সবাই, দিল্লীশ্বরের জগদীশ্বরেরা শেষকালে এই হল তার পরিণতি।

মুঘল সাম্রাজ্য, সত্য কথা বলতে গেলে একেবারে বিনা বাধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাস তালুকে পরিণত হয়ে গেল। বহুকাল আগে থেকেই ভারতের অপরিমিত ধন-সম্পদের সত্য ও কল্পিত কাহিনী সারা বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তার মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় জলদস্যু ও বণিকের দল একের পর এক উন্মত্তের মত ছুটে আসছিল এবং তাদের পরস্পরের হানাহানির ফলে সমুদ্রের জল ও স্থলভূমি রক্তরাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তার চূড়ান্ত অবসান ঘটল। ভাগ্যের নির্দেশে যারা আগে এসেছিল তারা পিছনে পড়ে গেল। আর ভাগ্যলক্ষ্মী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠে তার জয়মালা পরিয়ে দিলেন।

চমকিত হয়ে উঠল সবাই। যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা জেগে উঠল, যারা বসে ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি তাদের ছিল কি? হয়তো তা ছিল, কিন্তু এই উন্নততর মারণাস্ত্রে সু-সজ্জিত শক্তির বিরুদ্ধে কে তাদের সংগঠিত করবে, কে তাদের নেতৃত্ব দেবে? তাদের নেতৃস্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর প্রভূরা তখন মধুপানে মত্ত হয়ে বিলাস ব্যাসনে ডুবে আছেন। কে জানে হয়তো তখনও

তারা নিশ্চিন্ত মনে সুখ স্বপ্ন দেখছিলেন। দিল্লী অনেক দূর। প্রতিরোধ কি একেবারেই আসে নি? বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কি ক্রমে ক্রমেই জমে উঠছিলো না? কিন্তু বিক্ষোভ যতদিন পর্যন্ত চাপা দেয়া আগুনের মত ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে, ততদিন ইতিহাসের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ এল মুসলমান উলামা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

মূলতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিদেশী ও বিধর্মীদের শাসন অসহনীয় বলে তাদের কাছে মনে হয়েছিলো। কিন্তু যে কোনও ধর্মই হোক, ধর্মীয় জীবন বৈষয়িক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য।

প্রথম প্রতিবাদ তুললেন বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ।

মুসলমানদের হাত থেকে বাদশাহী শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কাজেই আঘাতটা মুসলমানদের মনেই বেশী করে বাজবে, এটা খুবই স্বাভাবিক । তাই তাদের এই বিরোধিতা হয়তো এই ধর্মীয় নেতার অভিমতের মধ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ স্পষ্টই রায় দিলেন যে, ইসলাম তাঁর ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, এই দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। কাজেই এই পরাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনই সজীবতা ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারে না। তাঁর এই সূত্রটির যুক্তিযুক্ত রূপায়ন ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে তার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে এসেছিলেন।

সেই দীর্ঘায়িত সংগ্রামের অতি সামান্য অংশই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আর তা খণ্ডে খণ্ডে ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে পরিচালিত হয়ে এসেছিলো। তাঁদের চরিত্র ও ভূমিকা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই জেহাদকে স্বাধীনতা

সংগ্রাম আখ্যা দেয়া চলে কি না এ বিষয়ে রাজনৈতিক পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র ও তার পরবর্তী ধর্মগুরু আব্দুল আজিজ তাঁর পিতার এই সূত্রটিকে কার্যকরী রূপে সম্প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানরা এই পরাধীন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই পরিবেশের মধ্যে কোনও প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে যথাযথভাবে ধর্মাচরণ করে চলা সম্ভব নয়। তাঁর দৃষ্টিতে, ভারত হচ্ছে 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ 'যুদ্ধরত দেশ'। তিনি এদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে এক ফতোয়া জারি করলেন। বৃটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হওয়া তাদের সকলের ধর্মীয় কর্তব্য। আর বৃটিশ শক্তিকে যদি তারা তাদের তুলনায় অনেক বেশী প্রবল মনে করে অর্থাৎ এই সংগ্রামে যদি জয়লাভের আশা না থাকে, তবে তারা যেন অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাইরের সেই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে হবে। বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যে এ বিষয়ে তাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করবে এ সম্পর্কে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না।

শাহ্ আব্দুল আজিজের এই ফতোয়া ভারতের মুসলমানদের এক অংশের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাঁর এই আহ্বানে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলো। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মুসলমান রাষ্ট্রগুলির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধর্মগুরু আব্দুল আজিজের কোন স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিলো না। আর যারা তাঁর এই ফতোয়াকে মান্য করে বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিলেন এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে যে সাহস, সংগঠনশক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকার আমরা গর্বের সাথে বহন করি। এই ইতিহাসকে অবহেলা করে বিস্মৃতির তলায় চাপা দেয়া এক জাতীয় অপরাধ।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী এই বৃটিশ বিরোধী জেহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল ক'জনেই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নামকরণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আবদুল ওয়াহাবের প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে সৈয়দ আহমদের বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কোনও সংযোগ ছিলো না । তবুও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।[37]

।।। ৯ ।।।

জাস্টিস আব্দুল মওদুদ: ওহাবী আন্দোলন

"উনবিংশ শতাব্দীতে পাক-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, উপরে তার যথাযথ রূপ বর্ণনার প্রয়াস করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, সশস্ত্র আন্দোলনটাকে "জেহাদী-আন্দোলন" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; কারণ এ আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিখ ও বৃটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন করে পাক-ভারতকে দারুল-ইসলাম রূপে কায়েম করা। ধর্মরাষ্ট্র স্থাপিত না হলে ইসলাম, ঈমান ও আমান প্রতিষ্ঠিত করা যায় না এবং ধর্মীয় সংস্কার সাধনও সম্ভব নয় – এটাই ছিল সেকালীন মুসলমান নেতাদের বিশ্বাস। আর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার কর্মে তাঁরা কায়েমী স্বার্থভোজীদের সঙ্গেও সংঘাতে

---

৩৭ সত্যেন সেন, *বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৯-১২

আসতে বাধ্য হয়েছিলেন অর্থনৈতিক কারণে। এজন্যে এই আন্দোলনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক রূপের সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনকে "জেহাদী আন্দোলন" হিসেবে চিহ্নিত করাই প্রশস্ত।

কিন্তু নেহাত মতলববাজিতে সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে "ওহাবী" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং বিদেশী শাসক ইংরেজরা মুসলমানদের সশস্ত্র আন্দোলনকে লোকচক্ষে হেয় করার হীন মনোবৃত্তিতে "ওহাবী" নামাংকিত করেছে। আসলে হেজাজে আঠারো শতকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব যে পিউরিটানিকা বা অতিনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সঙ্গে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। পাক-ভারতীয় আন্দোলনকারীরা কখনও নিজেদের "ওহাবীদের" সংগে চিহ্নিত করেননি। এ দেশী আন্দোলনের জনক হাযী শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজীজ, সৈয়দ আহমাদ শহীদ, হাযী শরীয়তুল্লাহ বা তিতুমীর কেউ আব্দুল ওহহাবের বা তার অনুগামীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেননি"।

" হয়তো আরবী আন্দোলনের সঙ্গে পাক-ভারতীয় জেহাদীদের ধর্মীয় সংস্কার প্রচেষ্টার কিছুটা মিল ছিল, কিন্তু সেহেতু জেহাদ আন্দোলনকে ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। জিহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সাহানাভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে। এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে। কিন্তু দুটি আন্দোলনকে একধর্মী বলে চিহ্নিত করা কখনো যুক্তি নির্ভর বা সমীচীন নয়"।[38]

[38] আব্দুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১, পৃ. ৯৭-৯৮

।।। ১০ ।।।

কোন সম্বন্ধ নাই: ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার[39]

"আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । তাঁহার দল অনেকটা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইবার পর তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তিনি এক বিরাট সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহা প্রথমে শিখ ও পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম করে, তাহাই এই আন্দোলনের প্রধান কীর্তি। ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা–আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"[40]

[39] অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮- ১৯৮০) একজন বাঙালি ইতিহাসবিদ। তিনি সচরাচর আর, সি, মজুমদার নামে অভিহিত। তিনি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সালে পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের উপর অনেক কাজ করেছেন। ১৯১৯ সালে "*Corporate life in ancient India*" শীর্ষক তাঁর পিএইচডি গবেষণা প্রকাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে *Early History of Bengal* রচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ভিয়েতনামের ইতিহাসের উপরে *"চম্পা"* নামক একটি পুস্তক, ও ভারতের ইতিহাসের উপরে *Ancient India* নামক একটি বই রচনা করেন।

[40] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮ ; History of Freedom Movement. iii

।।। ১১ ।।।

উপমহাদেশের অতীত রাজনীতির খণ্ড চিত্র:

এ. কে. এম নাজির আহমদ

১৮৩১ সনে বালাকোটে ইসলামী মুজাহিদদের পরাজয়

দিল্লীর শাহ আব্দুর রহীমের সন্তান ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী।

আব্বার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করে তিনি আল কুরআন ও আস সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ। আব্বার মৃত্যুর পর তিনি রহীমিয়া মাদরাসার প্রধান হন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সাথে তিনি বহু সংখ্যক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদিসের মাধ্যমে তিনি একদল মুত্তাকী ও মুহসিন ব্যক্তি গড়ে তোলার প্রায়াস চালাতে থাকেন।

১৭৬২ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর সুযোগ্য ছেলে শাহ আবদুল আযিয দেহলবী।

১৮১৮ সনে শাহ আবদুল আযিয দেহলবী তাঁর আব্বার চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে গঠন করেন ‘তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া’ নামে একটি সংগঠন। তিনিও একদল খাঁটি ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্রতী হন।

শাহ আবদুল আযিয দেহলবী ঘোষণা করেন যে, ইংরেজদের অধীনে ভারত দারুল হারবে পরিণত হয়ে গেছে, অতএব একে মুক্ত করার জন্য জিহাদ প্রয়োজন।

১৮২৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। ‘তরিকা মুহাম্মদিয়া’র নেতৃত্ব অর্পিত হয় সাইয়েদ আহমদ বেরেলবীর হাতে[41]। তিনি উপমহাদেশের সর্বত্র সফর করে সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিদেরকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে থাকেন। অতঃপর তিনি বেলুচিস্তান হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছেন। সেখান থেকে গিরিপথ ধরে পৌঁছেন উত্তরপশ্চিম সীমান্ত (খাইবার-পাখতুনখোয়া) প্রদেশে।

১৮২৭ সনের ১১ই জানুয়ারি সীমান্ত প্রদেশের (খাইবার-পাখতুনখোয়া) ‘সামাহ’ নামক স্থানে সমবেত আলিম, পাঠান সরদার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাইয়েদ আহমাদ বেরলবীকে আমিরুল মুমিনীন নির্বাচিত করেন।

সাইয়েদ আহমদ বেরলবী নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়াহ কার্যকর করার কাজে হাত দেন এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলেন একটি মুজাহিদ বাহিনী।

রণজিৎ সিং নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেননি। ফলে সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে শিখদের মুকাবেলা করে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

একদিকে তিনি যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন শিখ সৈন্যদের বিরুদ্ধে। অপরদিকে ইয়ার মুহাম্মদ খান, খাদি খান, পায়েন্দা খান, সুলতান মুহম্মদ খান, ফাতেহ খান, জবরদস্ত খান প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক পাঠান সরদারকে মুকাবেলা করছিলেন।

১৮৩০ সনে সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী শিখ সেনাদের পরাজিত করে বিজয়ী বেশে পেশওয়ার প্রবেশ করেন।

[41] তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মূলতঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। ১৭৬২ সালে উনার মৃত্যুর পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী। ১৮২৩ সালে শাহ আব্দুল আজীজের মৃত্যুর পর তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং তাঁর সময়ে তিনি এই তরীকার ইমাম হিসাবে তাঁর হাতে বাইয়াত করা হয়। সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তাসাউফের অন্যান্য তরীকার মূল ফোকাস হচ্ছে মানুষের রুহের সাথে আর তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মূল ফোকাস হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক অবস্থার সাথে, যাতে মানুষের বাতিনের সাথে সাথে জাহিরও শুদ্ধ হয়, রাসূলের সুন্নাহ মুতাবেক হয়। এই কারণে এই তরীকার নাম তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

কিন্তু যেইসব পাঠান সরদার ইসলামী শরিয়াহ মেনে নিতে পারেনি তারা নানা ধরনের চক্রান্ত চালাচ্ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে।
যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলবী কুনহার নদীর তীরবর্তী কাগান উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বালাকোট নামক স্থানে এসে ছাউনি ফেলেন। এটি ছিলো ১৮৩১ সনের এপ্রিলের শেষ ভাগের ঘটনা।
শিখ রাষ্ট্রপ্রধান রণজিৎ সিং ইংরেজ অফিসার ও পেশওয়ারে অবস্থিত তাঁর মিত্রদের সহযোগিতা নিয়েও সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলবী ও তাঁর সৈন্যদেরকে নির্মূল করতে পারছিলেন না।
অবশেষে তিনি তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি শের সিংকে ইসলামী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাঠান। সঙ্গে পাঠান সরদার আত্তার সিং, সরদার শ্যাম সিং, সরদার প্রতাপ সিং, রতন সিং, সাধু সিং, সরদার ওয়াজির সিং, গুরমুখ সিং লাহনা, লাখমির সিং, মহান সিং প্রমুখ সেনাপতিকে।
এক সর্বাত্মক যুদ্ধের বিশাল আয়োজন নিয়ে শিখ সেনারা এগিয়ে আসে। তারা কুনহার নদীর পূর্বতীরে অবস্থান গ্রহণ করে।
সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলবী, শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল (ইনি ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর অন্যতম পুত্র শাহ আবদুল গনি দেহলবীর একমাত্র ছেলে), মোল্লা লাল মুহাম্মদ, ওয়ালি মুহাম্মদ, নাসির খান ও হাবীবুল্লাহ খানের সেনাপতিত্বে ছোট ছোট সেনাদল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করেন।
১৮৩১ সনের ৬ই মে শিখ সৈন্যরা কুনহার নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।
তারা বালাকোট ও মাটিকোটের মধ্যবর্তী সমতল স্থানে এসে পৌঁছে। মুসলিম মুজাহিদগণ প্রান্তরে এগিয়ে গিয়ে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়।
প্রথমে ইসলামী ফৌজ বিজয়ী হয়। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্বে সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলবী আহত হন ও শত্রুদের হাতে পড়েন। তাঁর দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে নেওয়া হয়। রণাঙ্গনে

তাঁকে দেখতে না পেয়ে মুসলিম বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তদুপরি সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবীর সুযোগ্য সেনাপতি শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈলও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধে বহু মুজাহিদ প্রাণ হারান। শহীদদের মধ্যে বাংলাদেশেরও পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন। এই পাঁচ জনের একজন ছিলেন নোয়াখালির মাও. ইমামুদ্দিনের ভাই আলিমুদ্দিন।
প্রধান সেনাপতি শের সিং তাঁর সেনাবাহিনীর কয়েকজন মুসলিম সৈনিককে দিয়ে কুনহার নদীর তীরে সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলবীর লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেন। শের সিং পরদিন লাহোরে চলে যান। মাহান সিং ও লাথমির সিং কয়েক ব্যক্তিকে টাকার বিনিময়ে হায়ার করে সাইয়্যেদ আহমদ বেরলবীর লাশ কবর থেকে তুলে টুকরো টুকরো করে কুনহার নদীতে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেন।
'গোজেটিয়ার অব পেশওয়ার ১৮৮৩-৮৪' উল্লেখ করে যে নদীর স্রোতের তোড়ে তাঁর দেহের কিছু অংশ নদীর কিনারায় উঠে আসে এবং অংশগুলো পল্লীকোট (Pallikot) নামক স্থানে দাফন করা হয়।
বালাকোট প্রান্তরে জিহাদে অংশ গ্রহণকারী পূর্ব বাংলার মুজাহিদদের মধ্যে যাঁরা জীবিত থেকে দেশে ফিরেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাও. ইমামুদ্দিন (হাজীপুর,নোয়াখালি), সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (মলিয়াশ, মিরসরাই, চট্টগ্রাম) এবং মাও. আবদুল হাকিম সিদ্দিকী (চুনতি)। (মাও. মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেযজী হুজুর)- এর দাদা মাও. আকরামুদ্দিন মিয়াজী (লক্ষীপুর) ছিলেন মাও. ইমামুদ্দিনের শিষ্য ও খলিফা) [42]

[42] এ.কে.এম নাজির আহমদ, *উপমহাদেশের অতীত রাজনীতির খণ্ডচিত্র,* ঢাকা: দি ইনেডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ২০১৩, পৃ. ১২-১৫

।।। ১২ ।।।

ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস:

ড. মুহাম্মাদ ইনাম উল হক

তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন:

ভারতের তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদ । যদিও এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আরবের ওয়াহাবী মতবাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, তবুও ব্রিটিশ সরকার ইহাকে অনুরূপ নামে আখ্যায়িত করে । ১৭৮৬ সালে সৈয়দ আহমদ রায় বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি চাকুরির অন্বেষণে দিল্লী গমন করেন। তথায় তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ ও সুফী শাহ আব্দুল আজিজের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ আহমদ শাহ আব্দুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর ধর্মীয় অধ্যয়নে দিনাতিপাত করেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে (১৮০৭- ১৮০৯) তিনি কোরআন ও হাদীসের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করেন। কিছু ফার্সি ভাষা শিক্ষা করেন এবং শাহ আব্দুল আজিজ তাঁহাকে সূফীবাদের গূঢ়তম বিষয়ে পাঠদান করেন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ আমির খান পিণ্ডারীর অধীনে তিনি অশ্বারোহীর চাকুরি গ্রহণ করেন। সাত বৎসর কঠোর জীবন যাপনের পর ১৮১৭ সালের শেষ দিকে তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। একজন ধর্ম প্রচারক হিসাবে তিনি ফিরিয়া আসেন এবং মুসলিম সমাজের সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে শিখদের উদীয়মান ক্ষমতা মুসলমানদের পক্ষে এক বিরাট দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রামপুরে তাহার ধর্ম প্রচারণী ভ্রমণের সময় কিছু সংখ্যক আফগানের নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ শিখদের মুসলিম উৎপীড়নের খবর প্রাপ্ত হন। এই ঘটনা তাহার স্পর্শকাতর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং অনেক

সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করে। সমগ্র ১৮২০ সালে সৈয়দ আহমদ শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইয়া এবং তাহার উপর আস্থা আরও জোরদার করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। পাটনায় একটি দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণ বিরতিতে তাহার শিষ্যের সংখ্যা এত বৃদ্ধি লাভ করে যে, সেখানে রীতিমত একটি সরকার চালু করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পথিমধ্যে অবস্থিত শহরসমূহ হইতে তিনি খাজনা আদায় করেন। মুসলমান সম্রাটদের ন্যায় যথারীতি ফরমান দ্বারা তিনি চারিজন খলিফা মনোনয়ন দান করেন। পাটনায় একটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া শিষ্যের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে তিনি কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন। কলিকাতায় ভিড় এরূপ বাড়িয়া যায় যে, তিনি তাহার পাগড়ি খুলিয়া লোকদিগকে দীক্ষা দিতে বাধ্য হন। ১৮২২ সালে তিনি হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গমন করেন এবং এক বৎসর পর বোম্বাইয়ের পথে ফিরিয়া আসেন। এখানেও ধর্ম প্রচারক হিসাবে তাহার সাফল্য ছিল কলিকাতার ন্যায়ই ব্যাপক । উত্তর ভারতের দিকে ফিরতি পথে তিনি বেরিলীতে অনেক অনুগামী তালিকাভুক্ত করেন। ১৮২৪ সালে পাঞ্জাবের সমৃদ্ধিশালী শিখ শহরগুলির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে তিনি পেশোয়ার সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া লোকদের নিকট উপস্থিত হন। পাঠান গোত্রসমূহ উন্মত্ত উৎসাহের সহিত তাহার আহবানে সাড়া দেয়। সৈয়দ আহমদ যুদ্ধে জীবিতদিগকে গাজী হিসাবে যুদ্ধলব্ধ মালামাল এবং মৃতদিগকে শহীদ হিসাবে স্বর্গের নিশ্চয়তা প্রদান করেন। সমগ্র দেশ জাগরিত করিয়া এবং সুনিপুণ কৌশলে গোত্রগুলির সংযোগ স্থাপন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে তিনি কান্দাহার ও কাবুলের মধ্য দিয়া সফর করেন। শিখদের ধ্বংস সাধনের জন্য তাঁহাকে আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের নিকট তিনি শিখ দমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে অবস্থা

সুবিন্যস্ত করিয়া তিনি আল্লাহর নামে জিহাদে যোগদান করিবার জন্য সমস্ত মুসলমানকে সরাসরি আহবান করেন। ১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ হয়। ইতোমধ্যে উত্তর ভারতে মুসলিম যোদ্ধাদিগকে সেনাদলে ভর্তি করা আরম্ভ হয়।

শিখদের বিরুদ্ধে অসম সাফল্যের একটি কঠিন যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সর্বত্র জ্বালা-পোড়া ও হত্যা করিতে করিতে মুজাহিদগণ বিভিন্ন সময় সমতল ভূমির শিখদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করে। অপরদিকে শিখগণ সশস্ত্রভাবে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে করিতে পর্বতে ঠেলিয়া দেয় যুগের হিংস্র ভাবাবেগ এক ভয়াবহ প্রকৃতির স্বত্ব পিছনে ফেলিয়া যায়-ইহা রক্তের স্বত্ব। ১৮২৭ সালে সৈয়দ আহমদ তাহার মুজাহিদ বাহিনী লইয়া শিখদের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বিপুল ক্ষতি বরণ করিয়া পশ্চাদপসারণ করেন। কিন্তু শিখ সেনাপতিও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে সাহসী হন নাই। অতঃপর মুসলমানরা গেরিলা পদ্ধতির যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং শিখ প্রধানও অর্থের বিনিময়ে অতি অগ্রগামী মুসলিম গোত্রের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮২৯ সালে মুজাহিদদের হাত হইতে পেশোয়ার রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ সৈয়দ আহমদকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। এই কাজে মুজাহিদগণ অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। তাহারা শিখদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, তাহাদের বহু সংখ্যক যোদ্ধা হত্যা এবং শিখ সেনাপতিকে মারাত্মকভাবে আহত করে । শিখগণ পেশোয়ার রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও সৈয়দ আহমদের আধিপত্য সুদূর” কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মুজাহিদগণ উত্তর ভারত ও বাংলাদেশ হইতে দলে দলে জিহাদে যোগদান করে। ১৮৩০ সালে মুজাহিদগণ সমতল ভূমি দখল করে এবং বছর অতিক্রমের পূর্বেই পেশোয়ার মুসলমানদের করতলগত হয়। পেশোয়ার শহর অধিকার সৈয়দ আহমদের জীবনের চূড়ান্ত পর্যায় জ্ঞাপন করে। তিনি নিজেকে

খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্মুখ যুদ্ধে শিখদের পরাজয়ের পর রণজিৎ সিং স্বীয় কূটনীতি প্রয়োগ করেন এবং ছোটখাট মুসলিম রাজ্যসমূহের নিকট তাহাদের স্বার্থের ব্যাপারে পৃথকভাবে আবেদন করিয়া এগুলিকে সৈয়দ আহমদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ফলে শিখদের নিকট হইতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া সৈয়দ আহমদ পেশোয়ার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্তর্কলহ শীঘই নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের বাহিরে চলিয়া যায়। উত্তর ভারত ও বাংলাদেশের তাহার নিয়মিত চূড়ান্ত পর্যায় মুজাহিদগণ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু একদা পাঠানগণ যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এবং মুজাহিদগণও পরে ইহার কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সীমান্তের অনুগামীদের নিকট হইতে সৈয়দ আহমদ জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক-দশমাংশ কর আদায় করিতেন। কিন্তু এখন তাহারা এই কর প্রদানে ইতস্তত করে এবং শীঘ্রই দলত্যাগের চিহ্ন প্রদান করে। সম্পূর্ণ শরিয়তের প্রথানুযায়ী গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা ও দোষীদের শাস্তির জন্য কাজী নিয়োগের ব্যাপারটি পাঠানদের জন্য কিছুটা বাড়াবাড়ি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলি বিশেষত মেয়েদের বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি জনপ্রিয়হীন হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত কারণ একত্রিত হইয়া এই আন্দোলনের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহার চূড়ান্ত পর্যায়ে বালাকোটের পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। হাজারা জেলার বালাকোট নামক স্থানে একজন সেনাপতিকে সহযোগিতা করিতে যাইয়া সায়্যিদ আহমদ এক শিখ সেনাদল কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হন এবং ১৮৩১ সালে শহীদ হন।।[43]

---

৪৩ ড. মুহাম্মাদ ইনাম উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৭, পৃ. ৩৫০ – ৩৫২; ড. মুহাম্মাদ ইনাম উল হক ছিলেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের

॥ ১৩ ॥

Muslim Struggle for Freedom in Bengal: Dr. Muin Uddin Ahmad Khan[44]

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার প্রাক্তন উপাচার্য।

[44] . মুঈনুদ্দীন আহমদ খান (১৯২৬-২০২১) ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ, গবেষক ও লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ থেকে স্নাতকোত্তরের পর কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। আহমদ হাসান দানির তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে তিনি 'বাংলার সামাজিক আন্দোলন' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে রাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ে 'সেমিনার ইন ফিল্ড ওয়ার্ক কোর্স' সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামাবাদের ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়রে অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়া তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বাংলায় ইসলামে দর্শন চিন্তার পটভূমি যুক্তি তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধানে: প্রাচ্য বনাম প্রতিচ্য তাওহীদ ও বিজ্ঞান: ইসলামী বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন (সম্পাদক), [মূলঃ ওসমান বকর (১৯৯১) তাওহীদ এন্ড সাইন্স] ইংরেজিতে সিলেকশন্স ফ্রম দ্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রেকর্ডস অন ওয়াহাবি ট্রাইয়ালস (ওয়াহাবি বিচার-কার্যক্রমের উপর বাংলা সরকারের নথিপত্র), ওরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্সঃ এনকাউন্টার উইথ দ্য মডার্ন ওয়েস্ট, ইসলামিক রিভাইভালিজম ডিউরিং এইটিয়েদ, নাইনটিন্থ এন্ড টুয়েনটিয়েদ সেঞ্চুরি ইন নর্থ আফ্রিকা, সাউদি এরাবিয়া, পাকিস্তান,

মুসলিম স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম ইন বেঙ্গল: ড. মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান

'The next person to bring the message of Islamic revivalism to Bengal was Sayyid Ahmad Shahid, who arrived at Calcutta in A.D. 1820 and again in 1822. His reform movement was known as Tarigah-i- Muhammadivah (wrongly called Indian Wahhabism), and was opularized among the misses of West Bengal by Mir Nithar Ali alias Titu Mir from A.D. 1827 to 1831 and by Mawlawi Inayat Ali of Patna from A.D. 1831 onwards. These religious reform movements are reputed by contemporary writers to have brought about the greatest socio-religious revolution ever known in Bengal'. In the present study we are, however, con- cerned only with their impact on the common

ইন্ডিয়া এন্ড বাংলাদেশ, হিস্ট্রি অব ফরায়েজি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের ইতিহাস), এ বিবলিয়োগ্রাফিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন টু মডার্ন ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, তিতুমীর এন্ড হিজ ফলোয়ারস ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান রেকর্ডস (ব্রিটিশ ভারতীয় রেকর্ডে তিতুমীর ও তার অনুসারীরা) মুসলিম স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম ইন বেঙ্গল (বাংলায় মুসলমানদের স্বাধীনতার সংগ্রাম: পলাশী থেকে পাকিস্তান) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

man and with the role they played in the process of mass awakening in Bengal'.[45]

অর্থাৎ, বাংলায় ইসলামের পুনরুজ্জীবনের বার্তা নিয়ে দ্বিতীয় যে মানুষটি এসেছিলেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহীদ। তিনি কলকাতায় সর্বপ্রথম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এবং আবার ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেছিলেন। তার সংস্কার আন্দোলন তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া নামে পরিচিত ছিল (যাকে ভুলভাবে ভারতীয় ওহাবীবাদ বলা হয়)। ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মীর নিছার আলী ওরফে তিতুমীর এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাটনার মৌলভী ইনায়েত আলীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে এই আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলনসমূহ বাংলায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয়-সামাজিক বিপ্লব আনয়নকারী হিসেবে সমসাময়িক লেখকদের লেখায় মূর্ত হয়ে আছে। যাই হোক, বর্তমান গবেষণায় শুধু সাধারণ মানুষের উপর তাদের প্রভাব এবং বাংলায় গণ জাগরণের প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

।।। ১৪ ।।।

Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials

by Dr Muin Uddin Ahmad Khan

PREFACE

The Wahhabi documents published in this volume were chanced upon by me while I was looking

[45] Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1960, p. 16

through the Records of the East Pakistan Secretariat in search of materials for my thesis on the Fara'idi movement in Bengal. Out of the huge corpus of papers relating to the so-called Indian Wahhabi movement, I have here selected 179 important documents which throw new light on the nature of the spread of the movemont throughout Indo-Pakistan subcontinent as well as on the technique adopted by its votaries for the achievement of their goal

মুখবন্ধ[46]

বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলন নিয়ে আমার থিসিসের তথ্য-উপাত্তের খোঁজে আমি যখন পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয়ের রেকর্ডগুলো ঘাঁটছিলাম, তখন ঘটনাক্রমে ওয়াহাবিদের নিয়ে এই খণ্ডে প্রকাশিত নথিগুলো পেয়েছিলাম। তথাকথিত ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলন নিয়ে কাগজপত্রের বিশাল স্তুপের মধ্য থেকে আমি এখানে ১৭৯টি গুরুত্বপূর্ণ নথি বাছাই করেছি, যা ইন্দো-পাকিস্তান সাবকন্টিনেন্ট জুড়ে এই আন্দোলন বিস্তারের প্রকৃতি এবং সেইসাথে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত কৌশলগুলো পরিষ্কার করবে।[47]

INTRODUCTION

The documents presented in this volume are Judicial Proceedings of the Governments of

[46] . লেখক ড. মইন উদ্দীন আহমদ খান এই মুখবন্ধ লিখেছেন ১৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর।

[৪৭] . Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961(1st ed.), Preface.

Bengal and Madras, which were drawn for the suppression of a holy war or jihad campaign against the British rule during the third quarter of the nineteenth century. The jihad campaign was carried on by the followers of a Muslim religious reform movement, namely Tariqah-i-Muhanmmadivah, often abusively referred to as "Indian Wahhabism". These Proceedings consist of Police investigation, criminal proccedings, deposition of the accused persons and witnesses, Secretarial note-sheets and policy statements of the government.

ভূমিকা

এই খণ্ডে উপস্থাপিত দলিলগুলো হলো বাংলা ও মাদ্রাজ সরকারের কিছু বিচারিক রায়, যা উনিশ শতকের থার্ড কোয়ার্টারে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ ক্যাম্পেইন দমনের জন্য গৃহীত হয়েছিল। তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া নামে একটি মুসলিম ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অনুসারীদের দ্বারা এই জিহাদ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়েছিল। প্রায়শই তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়াকে অপমানজনকভাবে "ভারতীয় ওয়াহাবিবাদ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই রায়গুলোতে পুলিশি তদন্ত, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদের জবানবন্দি, সচিবদের নথিপত্র এবং সরকারের পলিসি স্টেটমেন্টসমূহ।[48]

Such reform trend started by Sayyid Ahmad Shahid and Shah Ismail Shahid at Delhi about A. D. 1818. Coming from the reform trend of Shah Wali Allah of Delhi (A. D. 1703-1762), Sayyid Ahmad and Shah Ismail re- asserted the necessity of following the path shown by the Prophet and of purging the Muslim society of un-Islamic customs and practices. Hence, they called their movement Taiqah-i-Mulammadiyah or the path of Muhammad and called themselves and their followers "Muhammadi". Some of their opponents, especially the government officials, designated their reform movement as "Wahhabism" or "Indian Wahhabism" by way of reproach.

১৮১৮ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদের মাধ্যমে শুরু হওয়া সংস্কারের এ ধারা আসলে এসেছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২) থেকে। সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পথ অনুসরণ এবং মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামিক রীতিনীতি মুক্ত করার গুরুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তারা নিজেদের আন্দোলনকে তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া বা মুহাম্মদের পথ বলতেন। এছাড়া নিজেদেরকে ও নিজেদের অনুসারীদেরকে "মুহাম্মদী" বলে অভিহিত করতেন। তাদের কিছু প্রতিপক্ষ, বিশেষ করে সরকারী কর্মকর্তারা নিন্দার্থে তাদের সংস্কার আন্দোলনকে "ওয়াহাবিজম" বা "ভারতীয় ওয়াহাবিজম" হিসাবে আখ্যা দিয়েছিল।[49]

৪৮ . Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, *Ibid,* p.1

৪৯ . Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, *Ibid,* p.3

।।। ১৫ ।।।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক: মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী[50]

حضرت سید صاحب اور مولانا شہید نے 1238 / 1239 ھ مطابق 1826 / 1827 میں یعنی ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک حجاز میں قیام فرمایا ، اس سے پہلے حجاز پر ترکوں کا 1818 میں کامل تسلط ہو چکا تھا ، مولانا شہید نے نجدیوں کے پاس اپنا آدمی بھیجا تھا ، مگر چونکہ وہ حجاز میں نہیں آ سکتے تھے انہوں نے نامہ بر کو واپس کر دیا کہ ہم اس وقت دعا کے سوا اور کوئی اعانت نہیں کر سکتے ، یہ واقعہ مکہ معظمہ میں نجد کے ثقہ عالموں کو معلوم ہے

دہلوی تحریک کو جس قدر مؤرخ نجدی تحریک سے ملاتے ہیں اس سے موافقین تو ناواقفی کا شکار ہوئے اور مخالفین نے اپنی سیاسی شرارت کے لیے اسے وسیلہ بنایا

بالاکوٹ کے بعد علاوہ علمی اختلافات کے سیاسی اصول پر بھی دونوں تحریکیں نہیں مل سکتیں ، نجدی اور یمنی عرب ایسٹ انڈیا کمپنی کے دوست اور ترکوں کے خلاف تھے ،

---

[50] উবাইদুল্লাহ সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী নেতা ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মী। দেওবন্দি উলামাদের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মাওলানা মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতে একটি প্যান ইসলামি আন্দোলনের জন্য ভারত ত্যাগ করা নেতাদের মধ্যে অন্যতম। এই ঘটনা পরবর্তীতে রেশমি রুমাল আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।

الصدر الحمید مولانا اسحاق نے دولت عثمانیہ سے تعلق پیدا کر کے عربی تحریکوں سے قطعا علیحدہ رہنا ضروری سمجھا

"হযরত সাইয়িদ সাহেব এবং মাওলানা শহীদ ১২৩৮ / ১২৩৯ হিঃ মুতাবেক ১৮২৬ / ১৮২৭ ইং একবছর থেকে কিছু বেশী সময় হেজাজে অবস্থান করেন। ইতিপূর্বে হিজাজে তুর্কীরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাওলানা শহীদ নজদীদের কাছে একজন লোক পাঠালেন কিন্তু যেহেতু ওদের পক্ষে হেজাজে আসা সম্ভব ছিল না, তাই তারা দূতকে এই বলে ফেরত পাঠালো যে, এইসময় দোয়া ছাড়া আমরা আর কোন সাহায্য করতে পারবো না। এই ঘটনা মক্কা মুয়াজ্জামায় নজদের বিশ্বস্ত আলেমদের জানা আছে।

দেহলভী আন্দোলনকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক নজদী আন্দোলনের সাথে একাকার করে থাকে, এর সাথে (দেহলভী আন্দোলনের সাথে)[51] একমত পোষণকারীরা শিকার হন না জানার, আর বিরোধীরা তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি হাসিলের জন্য এই তথ্যকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে।

বালাকোটের পর ইলমি মতভেদ ছাড়া, রাজনৈতিক মূলনীতির উপরও উভয় আন্দোলন এক হতে পারে না। নজদী এবং ইয়েমেনী আরব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মিত্র এবং তুর্কীদের শত্রু ছিল। আস-সাদর, আল-হামিদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক "দাউলাতে উসমানিয়া" অর্থাৎ উসমানী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আরবী বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে মোটেই সম্পর্ক না রেখে আলাদা থাকাকে জরুরী মনে করেছিলেন। [52]

---

[৫১] মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

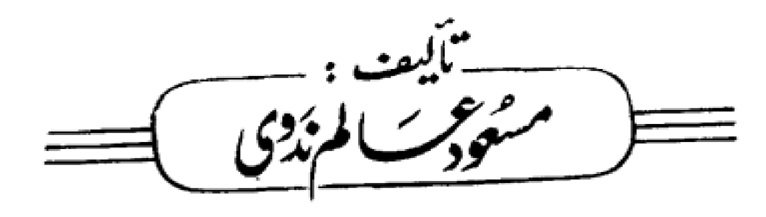
[52] মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক*, লাহোর: সিন্ধ সাগর একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ৯৯

||| ১৬ |||

হিন্দুস্তান কি পেহলী তাহরীক: মাসউদ আলম নদভী

ہندوستان کی

پہلی اسلامی تحریک



مکتبہ چراغ اسلام
۵/۱ قذافی مارکیٹ ○ اردو بازار ○ لاہور

کی طرف نسبت کرکے "وہابیت" کالقب ایک مذہبی گالی کے طور پر ایجاد کیا گیا۔

ترکوں اور انگریزوں کا یہ پروپیگنڈا خالص سیاسی حیثیت رکھتا تھا، مگر انہوں نے اسے مذہبی رنگ دینا شروع کیا۔ تاکہ مشائخ اور خوش عقیدہ مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ مشتعل کیا جا سکے۔ مولویوں اور پیروں کی خدمت سے فائدہ اٹھایا گیا۔ مکہ معظمہ کے شیخ احمد زینی دحلان (ف ۱۳۰۴ھ) اور بدایوں کے مولوی فضلِ رسول (ف ۱۲۹۶ھ) اور ان کے پیروؤں کی کوششوں سے افترا پردازیوں اور بہتان طرازیوں کا ایک انبار لگ گیا، جس سے کم و بیش آج تک جاہل عوام متأثر ہیں۔ مگر اہلِ علم میں اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ ساحرانِ فرنگ کی عشوہ طرازیوں کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ اب یہ تاریخی حقیقتیں خود بخود نمایاں ہونے لگی ہیں اور پروپیگنڈوں کا تاریک نقاب تار تار ہو رہا ہے۔

ہندوستان کی اس پہلی اسلامی تحریک اور نجد کی دعوتِ توحید و اصلاح کا فرق

یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر تھا کہ ہندوستان میں حضرت سیّد احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ (۱۲۰۱ــــ ۱۲۴۶ھ) اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ (۱۱۹۶ــــ ۱۲۴۶ھ) کے ماننے والوں اور نقشِ قدم پر چلنے والوں کو بھی 'وہابی' کے لقب سے یاد کیا گیا۔ حالانکہ انہیں نجد کے موحّدین سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ اور بات ہے کہ اصل سرچشمہ (کتاب و سنّت) کی وحدت کے باعث دونوں تحریکوں کے درمیان بہت کچھ مماثلت پائی جاتی ہے 'توحید' پر دونوں تحریکوں میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ شیخ الاسلامؒ کی کتاب التوحید اور مولانا شہیدؒ کی تقویۃ الایمان بہت کچھ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ پھر بھی غور سے دونوں تحریکوں کا مطالعہ کیا جائے تو بعض اہم اور بنیادی مسئلوں میں بھی اختلافِ رائے کی جھلک صاف نظر آتی ہے

طریقِ کار کا فرق تو قدم قدم پر ظاہر ہوتا ہے[1]۔ لیکن پروپیگنڈے اور سیاسی وسیسہ کاریوں کا برا ہو، اسلامی ہند کی اس پہلی تحریکِ تجدید وجہاد کو بھی "وہابیت" کا نام دے کر بری طرح بدنام کیا گیا[2] اور انگریز مصنّفوں اور ان کی دیکھا دیکھی اپنوں نے بھی اس نام کو اتنی شہرت دی کہ آج حضرت سیّد احمد شہیدؒ کے پیرو اور ماننے والے اسی بدنام لقب (وہابیت) سے یاد کئے جاتے ہیں اور راقم کو خود اس تحریر کے آغاز میں (وہابیت) کی حقیقت بیان کرنا پڑی۔ لیکن کوئی غلط بات، صرف شہرت اور پروپیگنڈے سے حقیقت نہیں بن سکتی۔ دجل اور فریب کا پردہ ایک نہ ایک دن چاک ہو کر رہتا ہے۔ آیئے ہم آپ کو داخلی اور خارجی شہادتوں کی روشنی میں دکھائیں کہ حضرت سیّد احمد شہید کی "دعوتِ تجدید وجہاد" نجد کی تحریکِ توحید و اصلاح سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔

یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیّد احمد شہیدؒ (مولود ۱۲۰۱ھ) کو کم عمری ہی سے تجدید واحیائے سنّت کی فکر دامن گیر تھی۔ اور ان کی دعوت میں ترکِ بدعات کی نسبت جہاد فی سبیل اللہ پر زیادہ زور تھا۔

اس کے برعکس شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہابؒ کی دعوت میں توحید اور ترکِ بدعات کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ شیخ الاسلام کی کتاب التوحید میں "جہاد" پر کوئی خاص باب یا فصل نہیں۔ دوسری طرف سیّد شہیدؒ کا کوئی مکتوب جہاد کے ذکر سے خالی نہیں ملتا۔

---

[1] تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:۔ مولانا عبیداللہ سندھیؒ کی (شاہ ولی اللہؒ اور ان کی سیاسی تحریک صفحہ ۱۳۶-۱۲۹) اور راقم کی "مولانا سندھیؒ کے افکار وخیالات پر ایک نظر (صفحہ ۱۱۶-۱۰۲)"

[2] اصل میں ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک پر "وہابیت" کا اطلاق صرف اس لئے کیا گیا کہ وہابیت کی اصطلاح پہلے گالی کے طور پر کافی مشتہر ہو چکی تھی۔ اب ایک نئی اصطلاح ایجاد کرنے اور چلانے کی زحمت کیوں اٹھائی جاتی۔

غالباً یہ دونوں ملکوں کے طبعی اور مقامی حالات کا نتیجہ تھا۔ نجد اور اس کے اردگرد مسلمانوں ہی جیسا نام رکھنے والے، بدعات اور شرک کی آلودگیوں میں مبتلا تھے۔ ہندوستان میں اپنوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ سات سمندر پار سے آئی ہوئی ایک قوم زمامِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ مزید براں ایک ہمسایہ لیکن نیم وحشی مذہبی گروہ پنجاب و سرحد کے غریب مسلمانوں کے لئے مستقل فتنہ بنا ہوا تھا۔ اس لئے سیّد شہیدؒ کے خلفاء اور مریدوں کا سارا جوشِ عمل جہاد وقتال ہی کی طرف مائل تھا اور ان کے نقشِ قدم پر چلنے والے اس راہ میں ہمیشہ سربکف رہے۔ اور آج بھی ان کا ایک گروہ حسنِ نیت کے ساتھ، خواہ غلط ہی سہی

آیۂ ربانی

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ	ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ	انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا۔
فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ	اس میں سچے اترے۔ پھر بعضے تو ان میں وہ ہیں
مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا	جو اپنی نذر پوری کر چکے ہیں۔ اور بعضے ان میں
بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا (الاحزاب-۲۳)	مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر و تبدّل نہیں کیا۔

کی یاد تازہ کر رہا ہے۔

سیّد شہیدؒ کا ظہور اس وقت ہوا، جب نجدیوں کی دعوت نجد اور اس کے اطراف میں محدود تھی اور حجاز پر قبضے سے پیشتر (۱۲۱۸ھ / ۱۸۰۳ء) دنیائے اسلام میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ محمد علی مصری نے (۱۲۲۷ھ / ۱۸۱۲ء) میں انہیں حرمین سے بے دخل کیا۔ اس طرح حرمین پر ان کا قبضہ نو سال سے زیادہ نہیں رہا۔ اور یہ زمانہ بھی یکسر جنگ و جدال میں بسر ہوا۔ حضرت سیّد شہیدؒ اور ان کے رفقاء ۱۲۳۷ھ میں حجِ بیت اللہ سے فارغ ہوئے، جب کہ مکّہ مکرمہ میں نجدیوں کا نام ونشان بھی نہ تھا۔ بلکہ مکّہ مکرمہ کے حکّام حاجیوں کو اہلِ نجد سے ادنیٰ تعلق کے شبہ پر تنگ کیا کرتے تھے۔ پھر "نجدی وہابیوں" سے سیّد صاحبؒ

کے ملنے اور متاثر ہونے کا واقعہ افسانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ نیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ سید صاحب رح حج سے پیشتر ہی سکھوں سے جہاد کا عزم کر چکے تھے۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ سید شہیدؒ کی دینی تحریک، تجدید و احیائے دین کی ایک مستقل تحریک تھی۔ مشیّتِ الٰہی یہ ہوئی کہ تجدیدِ اُمّت کا سہرا ان کے سر رکھا جائے۔ توفیقِ باری سے انہیں رفیق اور جان نثار بھی ایسے میسّر آئے، کہ صحابہ کرامؓ کے بعد اتنے نفوسِ قدسیہ کا ایک جا ہونا، تاریخ کے صفحات میں نظر نہیں آتا، نجد کی دعوتِ توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انگریز مصنّفوں میں ولیم ولسن ہنٹر W. W. Hunter نے حضرت سید شہیدؒ اور ان کی جماعت پر ناروا اور رکیک حملے کئے ہیں۔ اور ان کے پیرؤوں کی "باغیانہ" سرگرمیوں پر اس نے بہت تفصیل سے خامہ فرسائی کی ہے۔ یہ اسی کے دماغ کی اُپج ہے کہ سید شہیدؒ نجد کے وہابیوں سے متاثر تھے، اور اسی کی تقلید میں اپنوں اور غیروں نے بھی اس غلط بیانی[1] کا بار بار اعادہ کیا ہے۔ اس مختصر سی تحریر میں ہنٹر کی غلط بیانیوں پر تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ہمیں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ مجاہدین کا یہ سفید فام دشمن اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اس سلسلے میں جو لکھ سکا ہے، اس سے بھی سیدصاحب رح کا نجدیوں سے ملنا ثابت نہیں ہوتا۔ ہنٹر صاحب فرماتے ہیں۔

[1] ہمیں اہلِ نجد اور ان کی دعوتِ توحید و اصلاحِ اُمّت سے کوئی اختلاف یا بیر نہیں۔ ہمارا عمل کتاب و سنّت پر ہے، ہم نہ سید شہیدؒ کے مُقلّد ہیں نہ محمد بن عبدالوہابؒ نجدی کے۔ یہاں صرف غیروں اور اپنوں کی اس پھیلائی ہوئی غلط بیانی کا ازالہ مقصود ہے "کہ سید صاحب کی دعوتِ تجدید و جہاد نجد کی تحریکِ توحید سے متاثر تھی"۔ یہ بحث خالص علمی و تحقیقی ہے۔ حربِ عقاید یا سیاسی پروپیگنڈا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

"قیامِ مکّہ کے زمانے میں حکّام کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی۔ اس لئے کہ ان کی دعوت ان بدوؤں (محمد بن عبدالوہابؒ کے ماننے والوں) سے ملتی جلتی تھی جنہوں نے گذشتہ سالوں میں مقاماتِ مقدسہ کو بہت گزند پہنچایا تھا۔ مجاہدوں نے ان کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا اور حرم سے نکال دیا۔"[1]

گویہ "حقارت کا برتاؤ" اور "حرم سے نکالنے کا واقعہ" یکسر ہنٹر کے دماغ کی پیداوار ہے، پھر بھی ہم یہاں اسے نظر انداز کرتے ہوئے اہلِ نظر و اربابِ انصاف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ سید شہید (ش $\frac{۱۲۴۶ھ}{۱۸۳۱ء}$) شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہابؒ (ف $\frac{۱۲۰۶ھ}{۱۷۹۲ء}$) کی تعلیمات سے متاثر ہوئے تھے؟ ورنہ ہمارے پاس اس بات کا کافی ثبوت موجود ہے کہ مکّہ مکرّمہ کے حکّام و امراء نے سید شہیدؒ کی پوری خاطر مدارات کی اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔

خود ہنٹر اسی کتاب میں دوسری جگہ[2] لکھتا ہے:-

"کسی وہابی کے لئے ممکن نہ تھا کہ جان جوکھوں میں ڈالے بغیر مکّہ (مکرّمہ) کی سڑکوں پر چل سکے۔ یہ حال ۱۸۱۳ء سے ۱۸۳۰ء تک رہا۔"

اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت سید صاحب رح اور ان کے رفقاء $\frac{۱۲۳۷ھ}{۱۸۲۲ء}$ میں حج بیت اللہ سے شرف یاب ہوئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ بدنام وہابی مبلّغوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے؟ اصل یہ ہے کہ دنیائے اسلام کے عام انحطاط اور پستی کے عالم میں نجدی بدوؤں کا اٹھان اور ان کی "شمشیر زنی" "یورپی سیاست کاروں اور "اسلامی خدمت" کے ترکی اجارہ داروں کو ایک آنکھ نہیں بھائی اور انہوں نے "نجدیوں"

[1] The Indian Musalmans. طبع جدید صفحہ ۵۲

[2] The Indian Musalmans. ایضاً: صفحہ ۱۰۰

کو "وہابی" کا نام دے کر بدنام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دنیائے اسلام کی ہر مفید تحریک پر وہابیت کا لیبل لگانا معاندینِ اسلام کا عام شعار ہو گیا۔

انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں مضمون "وہابیت" کا لکھنے والا مشہور دشمنِ اسلام اور شاتمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارگولیوتھ عجیب و غریب حماقتوں کا مرتکب ہوا ہے مولانا شہیدؒ کو سید صاحبؒ کا بھانجا یا بھتیجا اور صراطِ مستقیم کو وہابیہ ہند کا قرآن کہتا ہے۔ اس کا مقالہ "وہابیت" (Wahabiyah) (مندرجہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام) تاریخی و تصنیفی اغلاط کا مضحکہ انگیز مرقع ہے۔ لیکن اسی انسائیکلوپیڈیا میں ابن سعود اور (سید) احمد کے مقالے اچھے اور عالمانہ ہیں۔ ہمیں یہاں سید احمد والے مقالے سے ہے۔ اس کا لکھنے والا[1] ایک حد تک سید شہیدؒ اور محمدؒ بن عبدالوھاب کی تحریکوں کو سمجھا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا فرق اس کی نگاہ میں ہے، لکھتا ہے:۔

"کچھ دنوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ (سید صاحب) وعظ و ارشاد کے لئے دورہ کرنے لگے۔ اِن کے خیالات ایک حد تک عرب وہابیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ سادہ عبادت، بدعات سے اجتناب، خرافات پر عقیدت سے بُعد اور انبیاء کی تعظیم میں حد سے زیادہ غلو سے پرہیز ــــــــ ان امور میں ان کے اور نجدی وہابیوں کے درمیان مماثلت ہے:۔

۱۲۳۶ھ میں سید احمد شہید حج کے لئے مکہ روانہ ہوئے اور جب دو سال کے بعد ہندوستان واپس ہوئے تو پنجاب کے مسلمانوں کو جور و ظلم سے نجات دلانے کے لئے تیاریاں کرنے لگے۔

اس میں شک نہیں کہ دونوں تحریکوں کے درمیان ایک حد تک مشارکت اور مماثلت

---

[1] انسائیکلوپیڈیا آف اسلام: مقالہ (Blumhart)

پائی جاتی ہے اور اصل سرچشمہ میں اتحاد کے باعث ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ کتاب و سنت سے براہِ راست اکتسابِ فیض کرنے والی جماعتیں جہاں بھی کام کریں گی، ان کا طریقِ کار اور دعوت کی بنیادی فکر ملتی جلتی ہوگی۔ لیکن اس "مماثلت و مشارکت" کی بنیاد پر جھوٹی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی اور یہ واقعہ اپنی جگہ ثابت اور متحقق ہے کہ سید صاحبؒ نجدی تحریکِ توحید سے بالکل متاثر نہیں ہوئے۔ اور نہ ہی نجدی عالم اور داعی سے ان کا ملنا ثابت ہے۔

وہابی اور اہلِ حدیث

اسی سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ مناسب ہوگا۔ ہندوستان میں حضرت سید صاحبؒ کی دعوتِ تجدید و جہاد کے ساتھ ساتھ اتباعِ سنت اور عمل بالحدیث کا چرچا بھی شروع ہوا۔ خود سید صاحبؒ اور اُن کے خاص ماننے والے یعنی اہلِ صادق پور تو اپنے کو "حنفی مع القول بالترجیح" کہتے تھے۔ مگر خود سید احمد صاحبؒ کی جماعت میں مولانا اسماعیل شہیدؒ (ش ۱۲۴۶ھ) کے اثر سے خالص "عاملین بالحدیث" کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ شروع شروع میں یہ دونوں طبقے یعنی حنفی اور اہلِ حدیث ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔ دونوں کا زور جہاد پر تھا اور اِن فروعی مسئلوں میں وہ روادار تھے۔ مگر آگے چل کر جب مجاہدین کی داروگیر شروع ہوئی اور ہر آمین بالجہر کہنے والے پر "وھابی" کا شبہ کیا گیا۔ اور "وھابی" کے معنی سرکاری زبان میں "باغی" کے ہو گئے (جیسا کہ آئندہ صفحات میں آتا ہے) تو ہندوستان کی جماعت اہلِ حدیث موجودہ شکل میں نمایاں ہوئی اور ان کے سرگروہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی (۱۲۵۶ھ — ۱۳۳۸ھ) نے سرکارِ انگریزی کی اطاعت کو واجب

---

[1] مولوی محمد حسین بٹالوی (ف ۱۳۳۸ھ) نے جہاد کی منسوخی پر ایک رسالہ (الاقتصاد فی مسائل الجہاد) فارسی زبان میں تصنیف فرمایا تھا اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی شائع کرائے تھے۔ معتبر اور ثقہ راویوں کا بیان ہے کہ اس کے معاوضے میں سرکارِ انگریزی سے انہیں "جاگیر" بھی ملی تھی ــــــ اس رسالہ کا پہلا حصہ ہمارے پیشِ نظر ہے۔ پوری کتاب تحریف و تدلیس کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ نمونہ کے لئے مندرجہ ذیل اقتباس کافی ہوگا۔

※ (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

قرار دیا۔ اور حد یہ کہ وقت کے بعض مشہور حنفی[1] علماء کو سرکار سے بغاوت کے طعنے دئے[2]۔
ان بیچارے کو یہ ہوش نہیں رہا کہ وہ اپنے کو سرکار کی زد سے بچانے کی فکر میں کیا کر رہے
ہیں اور اپنے ماننے والوں کو کس پستی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ مولوی محمد حسین صاحب
اور ان ہی جیسے بعض علماء اہلِ حدیث کی روش کا یہ نتیجہ ہوا کہ موجودہ جماعت اہلِ حدیث کا
عام رجحان فروعی مسئلوں تک، محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ پوری جماعت
اہلِ حدیث، ایسی ہی ہے حَاشَا وَکَلَّا! ان ہی میں اہلِ صادق پور بھی ہیں، جو سید صاحبؒ
کے عشق و محبت میں خود اُن کے اہلِ خاندان سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں، نیز ہندوستان کے
طول و عرض میں سینکڑوں اہلِ حدیث ایسے ملیں گے جن کے دل اب بھی جذبۂ جہاد سے معمور
ہیں۔ اور وہ اپنے اسلاف کی روش پر سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ اِس کے علاوہ سید صاحبؒ
کے ماننے والے اور ان کے مسلک کے مطابق جہاد و اصلاح کا ولولہ رکھنے والے اہلِ حدیث
طبقہ کے اندر محدود نہیں۔ اہلِ دیوبند (جو پکے حنفی ہیں) کا ایک اچھا خاصا طبقہ سید شہیدؒ
کے مسلک پر چلنا اپنے لئے سرمایۂ سعادت سمجھتا ہے۔ اہلِ دیوبند اور جماعت اہلِ حدیث
کے علاوہ بھی سمجھدار مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سید صاحبؒ اور مولانا شہیدؒ کے مشرب و
مسلک کو عین اسلام تصور کرتی ہے۔ یہ تمام طبقے عرفِ عام کے مطابق "وھابی" کی فہرست میں
آتے ہیں۔ مگر انہیں اہلِ حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اہلِ حدیث، ایک بالکل دوسری جماعت ہے،
جو باطنیوں اور شیعوں کے توڑ کے لئے پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی نئی جماعت نہیں [illegible]

※ نتیجہ مسئلہ اولیٰ: ازیں مسئلہ ثابت و متحقق شد کہ کمالِ اسلام و ایمان و نجاتِ اہلِ اسلام بر جہاد
موقوف و منحصر نیست۔ اگر مسلمانان نماز از فرائض دینی باز ندارند مجرد عبادت برائے
نجات و کمالِ ایمان کافی است۔ پس آنانکہ الخ۔ (ص ۳)

۱؎ مولانا فضلِ حق خیرآبادی (اسیرِ انڈمان: ف ۱۲۷۸ھ) اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی (ف ۱۳۱۷ھ)
وغیرھم۔ ۲؎ رسالہ اشاعت السنۃ۔

হিন্দুস্তানের ঐ প্রথম ইসলামী আন্দোলন[53] এবং নজদের দাওয়াতে তাওহীদ এবং ইসলাহ[54] এর মধ্যকার তফাৎ

" اسی پر وپگینڈے کا اثر تھا کہ ہندوستان میں حضرت سیداحمدشہید بریلوی اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی کے ماننے والوں اور نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی وہابی کے لقب سے یادکیاگیا۔ حالانکہ انہیں نجد کے موحدین سے کوئی تعلق نہیں تھا"

“এটা হচ্ছে ঐ প্রপাগান্ডার ফসল যে, হিন্দুস্থানে হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ (১২০১ – ১২৪৬ হিজরি) এবং মাওলানা ইসমাইল শহীদ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ (১১৯৬ – ১২৪৬ হিজরি) র অনুসারীদেরকে ওহাবী উপাধিতে স্মরণ করা হয়েছে। অথচ নজদের তাওহীদবাদীদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেটা ভিন্ন কথা যে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের কারণে উভয় আন্দোলনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল পাওয়া যায়। উভয় আন্দোলনে তাওহীদের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। শায়খুল ইসলাম[55] রাহিমাহুল্লাহ’র কিতাবুত্তাওহীদ এবং মাওলানা শহীদ[56] রাহিমাহুল্লাহ’র তাক্বিয়াতুল ঈমান[57]

---

[53] বালাকোট আন্দোলন, জেহাদ আন্দোলন, সাইয়িদ আহমাদ শহীদের আন্দোলন, তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন। -মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

৫৪ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের আন্দোলন। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

৫৫ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব। লেখক মাসউদ আলম নদভী উনাকে শায়খুল ইসলাম বলেছেন। আমরা বলি না।– মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

৫৬ ইসমাইল শহীদ দেহলভী

উভয় কিতাবে বহু বিষয়ে মিল রয়েছে। এরপরও উভয় আন্দোলনের প্রতি গভীর নজর করলে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদী মাসআলায় স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কাজের তরীকার পার্থক্য তো কদমে কদমে জাহির হয়।

لیکن پر وگنڈے اورسیاسی دسیسہ کاریوں کا برا ہو ، اسلامی ہند کی اس پہلی تحریک تجدید وجہاد کو بھی وہابیت کا نام دے کر بری طرح بدنام کیا گیا اور انگریز مصنفوں اور ان کی دیکھا دیکھی اپنوں نے بھی اس نام کو اتنی شہرت دی کہ آج حضرت سیداحمد شہید کے پیرد اور ماننے والے اسی بدنام لقب (دہابیپ) سے یاد کئے جاتے ہیں

কিন্তু প্রপাগান্ডাকারী এবং রাজনৈতিক ফায়দা ভোগকারীরা হিন্দুস্তানের এই প্রথম ইসলামী তাজদীদ ও জেহাদ আন্দোলনকে "ওহাবী" নাম দিয়ে বদনাম করে বড়ই অন্যায় করেছে। ইংরেজের সাথে সাথে নিজেদের কিছু লেখকও ঐ নামটিকে এতই বিখ্যাত করেছেন যে, এখন হযরত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র পীর-পীরানে পীর এবং অনুসারীদেরকে ঐ বদনাম লকব ওয়াহাবী দ্বারা স্মরণ করা হয়। যে কারণে আমাকেও হাকীকত বয়ান করতে হল। কিন্তু কোন

---

[57] মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাক্বিয়াতুল ঈমান ইসমাইল দেহলভীর কিতাব নয়। (দেখুন: শায়খুল হাদীস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহ, *আনোয়ারুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী*, পাকিস্তান: ইদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়্যাহ, খ. ১৩, পৃ. ৩৯২)
-তাহলে এই কিতাব কার লেখা? সালাফীদের কাছে এই কিতাবটি খুব প্রিয় এবং তারা বারবার এই কিতাব প্রিন্ট করেন। বৃটিশ আমলেই এই কিতাবটি ১ম ছাপা হল। আমার জানামতে এই কিতাবের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। বৃটিশের পক্ষে সবই সম্ভব। তবে বহু সম্ভাবনা থাকলেও অকাট্য কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। - মুহাম্মদ আইনুল হুদা

ভুল কথা শুধু খ্যাতি ও প্রপাগান্ডার কারণে হাকীকত হয়ে যায় না। ধোঁকা ও প্রতারণার পর্দা একদিন না একদিন দূর হয়েই যায়।

آیئے ہم آپ کو داخلی اور خارجی شہا دتوں کی روشنی میں دکھائیں کہ حضرت سیداحمد شہید کی دعوت تجدید و جہاد نجد کی تحریک توحید و اصلاح سے بالکل متاثر نہیں ہوئی

আসুন আমি আপনাদেরকে ভেতর এবং বাইরের সাক্ষীর আলোকে দেখাচ্ছি যে, সাইয়িদ আহমাদ শহীদের "তাজদীদ ও জেহাদ" আন্দোলন নজদের "তাওহীদ ও ইসলাহ" আন্দোলন দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয়নি।

এটা একটি বাস্তবতা যে, সাইয়িদ আহমাদ (জন্ম ১২০১ হি:) শহীদ বাল্যবয়স থেকেই "তাজদীদ ও ইহয়ায়ে সুন্নাত" এর ফিকির লালন করতেন এবং তাঁর দাওয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বেদাত তরক এবং জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র উপর গুরুত্বারোপ। অপরদিকে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ'র আন্দোলনে তাওহীদ এবং তরকে বেদাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শায়খুল ইসলামের কিতাবুত্তাওহীদে জেহাদের উপর আলাদা কোন অধ্যায় নেই। অপরদিকে সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র কোন মাকতূব জেহাদের আলোচনা থেকে খালি পাওয়া যায় না"।[58]

"সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র প্রকাশ ঐ সময় হয়েছিল, যখন নজদীদের আন্দোলন নজদ ও তার আশেপাশের এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। এবং ১৮০৩ সালে ১২১৮ হিজরিতে হেজাজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে মুসলিম বিশ্বে কেউ তাদেরকে চিনতো না। মুহাম্মাদ আলী মিশরি ১৮১২ সালে/ ১২২৭

---

[58] মাসঊদ আলম নদভী, *হিন্দুস্তান কি পহেলি ইসলামী তাকরীক*, লাহোর: মাকতাবায়ে চেরাগে ইসলাম, ১৯৮৯, পৃ. ১৮ -১৯

হিজরিতে হারামাইন থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করেন। হারামাইনে তাদের দখল ৯ বছরের বেশী টিকেনি। তথাপি এই সময়টাও যুদ্ধ-বিগ্রহে ভরপুর ছিল।

حضرت سید شہید اور ان کے رفقاء 1237 ھ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے ، جب کہ مکہ مکرمہ میں نجدیوں کا نام ونشان بھی نہ تھا - بلکہ مکہ مکرمہ کے حکام حاجیوں کو اہل نجد سے ادنی تعلق کے شبہ پر تنگ کیا کرتے تھے

হযরত সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথীরা হজ্জ শেষ করেন ১২৩৭ হিজরিতে, এই সময় মক্কা মুকাররামায় নজদীদের নাম নিশানাও ছিল না। বরং মক্কা মুকাররামা'র শাসকেরা নজদীদের সাথে সামান্য জানাজানির সন্দেহ হলে ঐসব হাজীদেরকে খুব কষ্ট দিত।[59] সুতরাং নজদী ওয়াহাবীদের সাথে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র দেখা-সাক্ষাত এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার কাহিনী সত্যের অপলাপ নয় তো আর কি? একথাও জেনে রাখা উচিৎ যে, সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ হজ্জের আগেই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন।

সারকথা হচ্ছে, সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র দ্বীনি আন্দোলন তাজদীদ ও ইহয়ায়ে দ্বীনের একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল। .... আল্লাহর ইচ্ছায় সাইয়িদ সাহেব এমন সাথী ও জানবাজ একদল সৈনিক পেয়েছিলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের পর এত পবিত্র আত্মা একত্রিত হওয়ার নজীর ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না। নজদের দাওয়াতে তাওহীদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার জামাতের উপর নগ্ন হামলা করেছেন। ... আর এই তথ্য হান্টারের পচা দেমাগ নিঃসৃত বিষোদগার যে,

[59] মাসঊদ আলম নদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০

সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ নজদের ওহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এবং এই হান্টারের অনুসরণেই আপন ও পর উভয় শিবিরের লেখকেরা এই ভুল[60] তথ্য বারবার রিপিট করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত লেখনিতে হান্টারের ভুল বয়ান সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাদের এতটুকু দেখানো উদ্দেশ্য যে, মুজাহিদীনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে দুশমনেরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও কালিমা লেপন করতে পারেনি। তাদের লেখনীতেই প্রমাণ হয় নজদীদের সাথে সাইয়িদ ছাহেবের দেখা হয়নি।

হান্টার সাহেব বলেন,

মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ বেদুইনদের কাছে যেরূপ সরল ভাষায় প্রচার চালান অনুরূপ সারল্য প্রদর্শন করে সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে এ পবিত্র নগরী বেদুইনদের হামলার শিকার হয়। মুফতি প্রকাশ্যভাবে সৈয়দ আহমদের পদাবনতি ঘটান এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন।[61]

"সৈয়দ আহমদের পদাবনতি ঘটান এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করেন" একেবারেই মিস্টার হান্টারের নিজ দেমাগের বানানো মিথ্যা তথ্য। এতদসত্ত্বেও এখানে কিভাবে প্রমাণ হয় যে সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ (১২০১ – ১২৪৬ হি:) শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব

[60] আহলে নজদ এবং তাদের দাওয়াতে "তাওহীদ ও ইসলাহে উম্মত" এর সাথে আমাদের কোন বিরোধ বা শত্রুতা নেই। আমাদের আমল কুরান-সুন্নাহ'র উপর। আমরা না সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র মুকাল্লিদ আর না মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী রাহিমাহুল্লাহ'র মুকাল্লিদ। এখানে আপন-পর লেখকদের ঐ ভুল বয়ানকে রদ্দ করা উদ্দেশ্য। - মাসঊদ আলম নদভী।

[61] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান* (অনু: এম. আনিসুজ্জামান), ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, তাবি, পৃ. ৪৮

রাহিমাহুল্লাহ’র শিক্ষায় প্রভাবিত হয়েছিলেন? অথচ আমাদের কাছে প্রচুর প্রমাণাদি রয়েছে যে মক্কার শাসকেরা সাইয়িদ সাহেবকে যথেষ্ট সম্মান করেছেন এবং উনাকে চোখ-মাথার উপরে রেখেছেন।

খোদ হান্টার তার বইয়ের অন্যত্র লিখেছেন,

“১৮১৩ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত মক্কায় ওয়াহাবীরা জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে রাস্তায় বের হতে পারেনি”। [62]

এবং আমরা ভালো করেই জানি সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর সাথীরা ১৮২২ খ্রি. / ১২৩৭ হি: তে হজ্জে তাশরীফ আনেন। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব বদনামী ওয়াহাবী মুবাল্লিগগণদের সাথে মুলাকাত হবে এবং তাঁদের শিক্ষায় আকৃষ্ট হবেন!! [63]

॥৷ ১৭ ॥৷

চেপে রাখা ইতিহাস: গোলাম আহমদ মোর্তজা

দিল্লীর শাহ ওলিউল্লাহ থেকে শুরু করে তার পুত্র, শিষ্য ও ছাত্রগণ এমনকি শহীদ সৈয়দ আহমদ এবং তার অনুগামীদের সকলেই মুসলমানদেরকে শরীয়তের উপর প্রত্যাবর্তন করার তাগিদ দিয়েছিলেন । ফলে কবর বাঁধান বা কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করা থেকে ক্রমে মুসলমানরা বিব্রত হতে থাকে। ইংরেজরা মুসলমান বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে, এ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কতকগুলো দরিদ্র ও দুর্বলমনা

[৬২] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২

[৬৩] মাসঊদ আলম নদভী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২১-২২

আলেমকে টাকা দিয়ে ঘুরিয়ে তাদের মুখ দিয়ে বলিয়েছিল তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ, তা করতে থাক। এ বিপ্লবীরা আসলে ওহাবী; ওরা নবী, সাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙার দল। ইংরেজ তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ মক্কায় যান, ওখানে গিয়েই তিনি ওহাবী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা। প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জীবনে একবার মক্কায় গিয়ে হজ্ব করা অবশ্যকর্তব্য হিসেবেই তিনি গিয়েছিলেন। তার হজ্জে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সাথে আরবের “ওহাবী আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিল না ।[64]

প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি

‘দিল্লির হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) ছিলেন সে যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। তিনিই প্রথম চিন্তানায়ক, আলেম যিনি ইংরেজ ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়া জরুরি মনে করে সংগঠনের বীজ ফেলে গেছেন। তাঁর পুত্র, ছাত্র ও শিষ্যগণ তাঁর এ সুপরিকল্পিত সংগঠনের সভ্য ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলী (রহঃ) ১৭৮৬ খৃষ্টানদের ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উপরোক্ত এ সংগঠনেরই সভ্য ছিলেন। ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তার মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না। তবে চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন। দৈহিক ক্ষমতাও তার সাধারণ মানুষের থেকে বেশি ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতেন। যুবক হবার পরেও মনের অঙ্কুরিত ইচ্ছা যেন ফুলে ফলে বড় হয়ে উঠল । তাই তিনি যোগ দিলেন ‘এক : ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভূর সেনাবাহিনীতে, শিখলেন সামরিক কলাকৌশল। এর সাথে

[64] গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস,* ঢাকা: মুন্সী মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০১০, পৃ. ১৮১

অন্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম। কিন্তু এ মুসলমান সামন্ত প্রভূ ইংরেজদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করল। সাথে সাথে ঘৃণাভরে চাকরি খতম করে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে। তারপর শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন ও সারা ভারত ঘুরে ফেললেন। পরে তিনি হজ যাত্রা করলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে মুসলমানদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামও করতে চাইলেন। তাই সর্বভারতীয় প্রচারে জানিয়ে দিলেন যে, কোরআন ও হাদীস বিরোধী কাজ মুসলমানদের করা চলবে না। অবশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন । পরে বিরাট একটি দল নিয়ে যখন ভারত পরিক্রমা সহ মক্কা থেকে হজ্ব করে ফিরলেন, তখন দেখা গেল এ ভ্রমণে তার দু'বছর দশ মাস পার হয়ে গেছে। সে বিপুল সংখ্যক লোকের খাওয়া দাওয়া ও খরচের সব অর্থটুকু তার ভক্তদের কাছ থেকে উপহার হিসেবেই তিনি পেয়েছিলেন । জানা যায়, শুধু হজ যাত্রীদের টিকিট কিনতেই লেগেছিল তখনকার ১৩৮৬০ টাকা, আর হজ্ব যাত্রার প্রক্কালে রেশনের মাল কিনেছিলেন ৩৩৯১ টাকা।

আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমদ দুজনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলিগড়ী আহমদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'স্যার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকরির পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার । আর সব শেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাকে শহীদ হতে হয়েছে, ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন তিনি তাঁর রক্তমাখা কাচা কাটা মাথা ।

এ বিরাট আধ্যাত্মিক বিপ্লবী শহীদ বীরকে মিঃ উইলিয়াম হান্টার The Indian Musalmans পুস্তকে ডাকাত, ভণ্ড ও লুণ্ঠনকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন । ভার চাপা পড়া ইতিহাসকে আজ কিন্তু কিছু বাস্তববাদী ঐতিহাসিক প্রকাশ করার জন্যে নতুন

সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী তাদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর লেখা অন্তত এটা প্রমাণ করে যে, সত্য তথ্য প্রকাশে তিনি সুস্পষ্টবাদী । তাই তাঁর লেখা "*ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস*" থেকে **সৈয়দ আহমদ বেরেলী** সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যার জীবনস্মৃতি প্রেরণা যুগিয়েছিল যুগে যুগে এ দেশের মহাবিপ্লবীদের । যার জীবনাদর্শ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সে সাথে সাথে দেশের মধ্যে থেকেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা ইত্যাদির পথ দেখিয়েছিল পরবর্তীকালের মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, এন এন, রায়, রাসবিহারী এমনকি নেতাজীকেও । কে এ মহাবিপ্লবী, যার আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল? ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে শত হাজার মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণায় মৃত্যু। কে ইনি? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে এঁর নামোল্লেখ থাকলেও এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা স্বাভাবিকও নয়। আর আজও স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়ান হয়, সে সব এ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র । তাই কি করে জানবে এ মহাপুরুষের নাম? **এ মহান মহাবিপ্লবী মহাবিদ্রোহীর নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভী**।" (পৃষ্ঠা ৭-৯)

রতন লাহিড়ী আরও বলেন, "বিপ্লবীরা না পিছিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে লাগল । তারপর যুদ্ধ হল শেষ । বিপ্লবী বাহিনী হল ধ্বংস । তাকে সকলে দেখেছিল বীরের মত লড়াই করতে একটার পর একটা শত্রু সৈন্য কচুকাটা করতে।" যদিও নিজেরা একে মৃত বলে কবর দেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু কেহ এর শেষ পরিণতি দেখেনি"। (শ্রী লাহিড়ীর ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৭-৮)

এবার উইলিয়াম হান্টারের লেখা 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থের বিচারপতি আবদুর মওদুদের বঙ্গানুবাদ থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তার পূর্বে বলে রাখি, মিঃ হান্টার হচ্ছে মিঃ হর্ডসনের অন্তরঙ্গ বান্ধু। যেহেতু তিনি পুস্তকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখ দিয়ে পুস্তকটি বন্ধু মিঃ হর্ডসনের নামেই উৎসর্গ করেছেন । যে হর্ডসন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দু'জন পুত্রসহ রাজবাড়ির কচিকাঁচা ২৯ জন শিশুকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সে যা হোক, লেখক যে একজন বিখ্যাত তথ্য সংগ্রহকারী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । যদিও তার লেখায় কোরআন হাদীসের বিরুদ্ধে, মাওলানাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মহামনীষীদের বিরুদ্ধে অনেক অশ্লীল কথা আছে। এ বইটি লিখতে সরকারি তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা তার পক্ষে সহজ ছিল, যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারি সিভিলিয়ান। তবে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Calcutta Review এর C.C.I ও CII সংখ্যায় 'Wahabis in India শিরোনামে যে তিনটি বিরাট বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার লেখকের বিচিত্র ছদ্মনাম ছিল 'Anonymous'-সে তিনটি প্রবন্ধই মি. হান্টারের পুস্তকের রক্ত, মাংস ও অস্থি বলা যায় ।

হান্টার লেখেন, "অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সমস্ত সুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেয়া তাদের পক্ষে ফরয কি না।" **"পাঞ্জাব সীমান্তের বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ "** (পৃষ্ঠা ৩)

হান্টার **সৈয়দ আহমদ** সম্পর্কে আরও বলেন, "একজন মশহুর দুস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসেবে তার জীবন আরম্ভ। বহু বছর তিনি মলিব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলোর উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিং পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চল সমূহে যে কঠোর

নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে কোন মুসলমান দুস্যুর পক্ষে পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিমানের মত নিজেকে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লির একজন মশহুর আলেম শাহ আবদুল আজিজ-এর কাছে শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন । তিন বছর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যে সব অনাচার বা বিদয়াত ঢুকে পড়েছে, সেগুলোর প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে একদল গোঁড়া ও হাঙ্গামাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। ১৮২০ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঞ্চলে সফর করে ফিরলেন। তখন তার মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্বরণ করে সাধারণ নফরের মত তার খিদমত করত এবং দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মত খালি পায়ে তার পাল্কির দুধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। ১৮২২ সনে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান এবং এভাবে তার পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আল-খেল্লায় বেমালুম ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। (**শিখরা লাহোরে ও অন্যান্য স্থানে বহুদিন ধরে হুকুমত চালাচ্ছে**।) তারা মসজিদে আযান দিতে দেয় না এবং গো-জবেহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে । যখন তাদের অপমান-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন **হযরত সৈয়দ আহমদ** (তার সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক) একমাত্র দ্বীনের হিফাযত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন মাত্র খাদিম সাথে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ারের দিক দিকে রওনা হলেন ।....কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান তার আহ্বানে আল্লাহ'র রাহে চলতে তৈরি হয়েছে এবং ১৮২৬ সনের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করা হয়েছে) * ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা

অকুতোভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে আর সে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয়।...তার প্রকৃত মুজাহিদ বাহিনী ছিল হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধদের নিয়ে গঠিত। **ইমাম আহমদ সাহেবের** প্রধান খলিফাদের মধ্যে দু'ভাই ছিলেন । তারা হচ্ছেন জনৈক নামজাদা নরঘাতকের দুই পৌত্র। তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলোর উপর পড়তে লাগল বটে, কিন্তু **বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলেই তারা তীব্র উল্লাস উপভোগ করত।** যতদিন আমরা জিহাদের দিকে নজর দিইনি, ততদিন তারা দলে দলে হামলা করে আমাদের প্রজা ও মিত্রদের ধরে নিয়ে গেছে কিংবা খুন করে ফেলেছে: আর যখন শক্তি প্রয়োগে তাদের নির্মূল করতে **আমাদের সৈন্যদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করছে** এবং অনেককাল ধরে বৃটিশ ভারতের সীমান্ত বাহিনীকে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রেখেছে ।
আমাদের সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মান্ধ প্রজাদের সাহায্যপুষ্ট একটা বিদ্রোহী ও নির্বাসিতের বসতি তীব্র হিংসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে, এটা বোঝা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে, একটা সুসভ্য দেশের সেনাবিহনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহুকাল টিকে থাকতে পারে।....শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সনের তার (আহমদ সাহেবের) পতন ও মৃত্যু হল।" (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা ১-২১)
পূর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে যদিও হান্টার এসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যদিও বিপ্লবী সৈয়দ আহমদের চরিত্রে মিথ্যার কালি মাখিয়েছেন, তবুও প্রমাণ হয় তার বীরত্ব, বাহাদুরি, সংগঠন ও আত্মত্যাগের কথা।
সৈয়দ আহমদ ও তার অনুসারীরা প্রায় সকলেই কোন যুদ্ধে এবং কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হন-সে সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা এ রকম: বালাকোটের শেষ যুদ্ধের পূর্বেও **সৈয়দ আহমদ**

সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিপক্ষ সৈন্য পাহাড় থেকে নীচে না নামা পর্যন্ত বা তারা আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ বন্ধ থাকবে । পাতিয়ালার সৈয়দ চেরাগ আলী বিপ্লবী যোদ্ধাদের জন্য পায়েস রান্না করছিলেন আর বিপক্ষ সৈন্যদের ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। হঠাৎ তার ভাবান্তর হয়-যে লাঠি দিয়ে তিনি ফুটন্ত পায়েস নাড়াচাড়া করেছিলেন তা দিয়ে তিনি এ তামার হাঁড়ির গায়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন । আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ভাইসব, স্বর্গ হতে লাল পোশাক পরে অপ্সরীরা দল বেঁধে নামছে।' এ বলে অস্ত্র হাতে তিনি কারও পরামর্শ না নিয়ে ছুটতে লাগলেন শত্রু সৈন্য ঘাঁটির দিকে । "এ ঘটনা এমনই ক্ষিপ্রতার সাথে হইয়া গেল যে, কিসে কি হইল কেহ বুঝিবার পূর্বেই সৈয়দ 'চেরাগ আলী গুলি লাগিয়া শহীদ হইলেন । তিনিই বালাকোটের প্রথম শহীদ ।" দ্রষ্টব্য 'হঃ সৈয়দ আহমদ শহীদ", পৃষ্ঠা ৫৯৮)। বাধ্য হয়েই পরিকল্পনা বিরোধী কাজ মোজাহেদ বাহিনীকে করতে হল, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে অপ্রস্তুতির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল। এ "অতর্কিত' আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং শেষ পরিণতিতে প্রায় সকলকেই নিহত হতে হয়েছিল ।

বিখ্যাত লেখক ও বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাচ্ছি-"১৮৩১ খৃষ্ঠাব্দের ৬ই মে এ যুদ্ধ হয়। এটাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। এক পক্ষে বিশ হাজার সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য....(আর এক পক্ষে) ভগ্নোৎসাহ প্রায় ৯০০ মোজাহিদ। এ ছিল মৃত্যু অভিসারীদের বাহ্নিবন্যার মুক্তিস্নান। দুর্দম বেগে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন 'জীবন মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোত'। শাহাদত বরণ করলেন সঙ্গীসহ **সৈয়দ আহমাদ** ও শাহ ইসমাঈল।" (দ্র: ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তার সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তারা এবং তাদের আন্দোলন সৈয়দ আহমদ বেরলবী রাহিমাহুল্লাহ'র অংকুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়। (ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস, শ্রীরতন লাহিড়ী, পৃষ্ঠা ৯)

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) নিহত হওয়ার পর যেসব আন্দোলন, বিদ্রোহ বা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে বিকৃত করে তাদের নাম পাল্টে কোনটাকে বলা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, কোনটাকে বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন, মুহম্মদী আন্দোলন, আবার কোনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। [65]

।।। ১৮ ।।।

বাংলার ইতিহাসঃ প্রফেসর ড. আব্দুল করীম

মক্কায় থাকা অবস্থায় তীতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলতীর সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের নেতা। এই তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে ইংরেজ শাসকরা ওয়াহাবী আন্দোলন রূপে অভিহিত করে। তীতুমীর এই সময়ে সৈয়দ আহমদ শহীদের মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।[66]

৬৫ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭৬ – ১৭৯।

66 প্রফেসর ড. আব্দুল করীম, *বাংলার ইতিহাস,* ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ২৯৫

।।। ১৯ ।।।

DEVELOPMENT OF SUFISM IN BENGAL:

Muhammad Ismail

'Shah Abdul Aziz, who went a step further than his father and declared India was no longer dar-ul-lslam, but dar-ul-harb, or zone of war, thus recognizing the legality of jihad, or holy war, to defend the cause of Islam.

The militant movement for the rehabiliation of Islam in India in the early years of the 18th and 19th centuries was categorized as wahhabi by the British, on the basis of the Arabian paralled of that name. This was done by the Britishers by taking advantage of the atmosphere of bitterness against the wahhabis among the Muslim masses of India, This name was given to the reforms of Shah wali Allah's school by the Britishers firstly by W. W. Hunter in his Indian Musalmans which aimed of creating a division among Muslims of India following the British of policy of divide and rule'.[67]

শাহ আবদুল আজিজ তাঁর বাবার চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ আর দার-উল-ইসলাম নয়, বরং দার-উল-হারব বা যুদ্ধক্ষেত্র। এভাবে ইসলামের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি জিহাদ বা পবিত্র যুদ্ধের বৈধতার স্বীকৃতি দিলেন।

67 Muhammad Ismail, De*velopment of Sufism in Bengal*, PhD Thesis, Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University Aligarh (India), 1989. P. 209

১৮ ও ১৯শ শতকের শুরুর দিকে ভারতে ইসলামের পুনর্বাসনের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনকে ব্রিটিশরা ওহাবী শ্রেণীর বলে আখ্যা দিয়েছিল- আরবের একই রকম নামের ভিত্তিতে। আসলে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওহাবীদের প্রতি তিক্ত মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা এই কাজটি করেছিল। সর্বপ্রথম শাহ ওলিউল্লাহ দিালবির ঘরানাকে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তার ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থে এই নাম দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের বিভাজন পূর্বক শাসন নীতির আলোকে ইন্ডিয়ার মুসলমানদের মধ্যে একটি বিভাজন তৈরি করা।

।।। ২০ ।।।

আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভুমিকা: জুলফিকার আহমাদ কিসমতি

প্রাক – ইংরেজ আমলের ভারত

আজাদী আন্দোলনের সূচনা সম্পর্কিত আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই গোলামীর যুগ ও তার পটভূমি সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা জাগে । এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি যে, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক ইসলামী জীবনধারা থেকে বিচ্যুতির ফলে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানরা দুর্বল ও বিদেশী দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি হিমালয়ান উপমহাদেশেও তারা মোগলপতন যুগে প্রথমে শিখ–মারাঠা কর্তৃক বিপর্যস্ত ও ইংরেজদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের পর থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় পতনের সূচনা ঘটে। আওরঙ্গজেবের তিরাধানের পর তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা দিল্লীর মসনদে আসীন হয়েছিলেন, তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল শাসক। ধর্মীয়, চিন্তাগত, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব এবং পতন দেখা

দিয়েছিলো, তা রোধ করার মতো ক্ষমতা তাদের মোটেই ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকগণ নিজেদেরকে নামেমাত্র দিল্লীর অধীন বলে প্রকাশ করলেও কার্যতঃ ঐসব আঞ্চলিক শাসক স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবেই সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ শাসন করতেন।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসন ক্ষমতার এ দুর্বলতা লক্ষ্য করেই বণিক হিসাবে আগত ইংরেজরা এদেশের শাসক হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পরিণামে, ঘরের ইঁদুরদের কারণে পলাশীযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটে । বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করে। এভাবে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে বাংলা দখল করার মধ্য দিয়েই ইংরেজদের সেই স্বপ্নসাধ পূর্ণ হতে থাকলো । পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রকে লক্ষ্যস্থল স্থির করে তারা ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো । একের পর এক কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম অমুসলিম শাসকদের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলো ।

১৭৯৯ খৃঃ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এবং ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতাযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ মহীশূরের বীর সুলতান টিপুকে ইংরেজরা পরাজিত ও হত্যা করলো । সর্বশেষে সম্রাট শাহ আলমকে জায়গীর হিসাবে লাল কেল্লা ছেড়ে দিয়ে ১৮০৫ খৃঃ দিল্লী হস্তগত করে ইংরেজরা সমগ্র ভারতে নিজেদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলো।

কয়েকটি জিজ্ঞাসা

ইতিহাসের কোন ঘটনাই সম্পর্কহীন নয়। কার্যকারণ পরম্পরার ফলেই ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয় । বস্তুতঃ এ কারণেই দেখা যায়, বাংলা পাক–ভারত উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনের সাথে ১৭৫৭, ১৮৫৭ এবং ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত । সম্রাট

আলমগীর আওরঙ্গজেবের প্রথম উত্তরাধিকারীদের যুগ থেকে এ জাতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে ক্রমাবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিয়োগান্ত ঘটনা তাদের জন্য প্রথম বাস্তব ও বেদনাদায়ক আঘাত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তার পরবর্তী কালে ১৮৫৭ ও ১৯৪৭ সালের ঘটনায় ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের বাস্তব ফলশ্রুতি।

কিন্তু এই পুনর্জাগরণ কার চিন্তার ফসল ছিল? উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর বীজ মুসলমানদের চিন্তা ও মগজে কে বপন করেন? হতোদ্যম পরাজিত মুসলিম জাতি এ চেতনা ও অনুপ্রেরণা কোথেকে পেয়েছিলো, যদ্দরুন ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ রাজ – শক্তির বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল? তার পূর্বে ১৮৩১ সালে কোন্ অনুপ্রেরণা তাদের বালাকোটের রণাঙ্গনে ছুটে যেতে পাগল করে তুলেছিলো এবং কোন্ যাদুপ্রেরণা এই রণক্লান্ত ভগ্নহৃদয়ের মুসলমানদেরকে পুনরায় বলবীর্য ও শক্তি – সাহসে উজ্জীবিত করে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের শেষ বিজয়ের আগ পর্যন্ত সংগ্রামে অটল রেখেছিলো? -এ সব বিষয় আজ ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা ও তরুণ সমাজের কাছে তুলে ধরার সময় এসেছে । সময় এসেছে অবিভক্ত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে মুসলমানরা কোন্ দুঃখে উপমহাদেশে নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছিল। যার একাংশ পরে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে গঠিত হয়। এজন্যে সৃষ্ট আন্দোলনের সঠিক পটভূমি জাতির সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা এবং এরই আলোকে সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করা একান্ত প্রয়োজন।

অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র নিরাশার কালছায়া নেমে এলো: আলেমগণই আজাদী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন

কোনো সফলতাই ত্যাগ, শ্রমসাধনা ও সংগ্রাম ছাড়া আসে না। বিশেষ করে জাতীয় জীবনের সফলতার ক্ষেত্রেতো কোনো অবস্থাতেই নয়। তেমনিভাবে ১৯৪৭ সালে পাক–ভারত উপমহাদেশের আজাদীও বিছিন্ন কোনো আন্দোলনের ফলে আসেনি। তার পেছনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ত্যাগ ও রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস । সেই ত্যাগ – সাংগ্রামই ধীরে ধীরে গোটা অবিভক্ত ভারতের আজাদীর পথকে প্রশস্ত করেছিলো। আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে , সেই সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ আলেম সমাজই । ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা দিল্লীর শাসক সম্রাট শাহ আলমকে লালকেল্লা, এলাহাবাদ ও গাজীপুরের জায়গীর ছেড়ে দেয়। কিন্তু উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ক্ষমতার শেষবিন্দুটি পর্যন্ত মুছে দেয়ার পূর্বেই ইংরেজগণ সমগ্র ভারতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল । সারা দেশে আলেম ও গায়ের আলেম সুধী সমাজের মধ্যে প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দেয়ার সাহস এমন কারও ছিল না যে, বিদেশীর শাসনাধীন ভারত হচ্ছে 'দারুল হরব', যেখানে জেহাদ করা প্রতিটি খাঁটি মুসলমানের কর্তব্য। সর্বত্র নৈরাশ্যের কাল ছায়া ঘনীভূত হয়ে এসেছিলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন সকল শ্রেণীর মুসলমান। ইংরেজগণ উপমহাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা- সভ্যতা, ধ্যান–ধারণা, কৃষ্টি–সংস্কৃতির প্রসার দান ও এদেশের এতিহ্যবাহী শাসকজাতি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যমুখী ও হীনমনা করে গড়ে তোলার জন্যে গভীর পরিকল্পনায় নিয়োজিত ছিলো। তারা অমুসলিম এবং মুসলমানদের থেকেও কিছুসংখ্যক লোককে ইতিমধ্যেই

হাত করে নিয়েছিল। মুসলমান জাতির জন্যে ঐ সময়টি ছিল এক কঠিন পরীক্ষার ।

মওলানা শাহ আবদুল আজীজের বিপ্লবী ফতওয়া

ঠিক এ সময়ই ওয়ালিউল্লাহ আন্দোলনের প্রধান নেতা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী এক বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করে এই হতোদ্যম জাতিকে পথের সন্ধান দেন এবং তাদেরকে ইসলামের জেহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবার আহবান জানান । শাহ আবদুল আজীজ তার পিতা মহামনীষী ও ইসলামী রেনেসাঁর উদগাতা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর তিরোধানের পর (১৭৬৭ খৃঃ) থেকে দিল্লীর রহিমিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালকে কেন্দ্র করে ওয়ালীউল্লাহ চিন্তাধারার প্রচার, জনসংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে "তারগীবে মুহাম্মদী" নামে ইসলামী পুনর্জাগরণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন । এই নির্ভীক মোজাহিদ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফতোয়ার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে,

"এখানে (ভারতে) অবাধে খৃষ্টান অফিসারদের শাসন চলছে, আর তাদের শাসন চলার অর্থই হলো, তারা দেশরক্ষা, জননিয়ন্ত্রণ বিধি, রাজস্ব, খেরাজ, ট্যাক্স, ওশর, ব্যবসায়পণ্য, চো –ডাকাত দমনবিধি, মোকদ্দমা, বিচার, অপরাধমূলক সাজা প্রভৃতিতে (যেমন- সিভিল, ফৌজ, পুলিশ বিভাগ, দীওয়ানী ও ফৌজদারী, কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদিতে) নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ সকল ব্যাপারে ভারতীয়দের কোনই অধিকার নেই। অবশ্য এটা ঠিক যে, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, আজান, গরু জবাই- এসব ক্ষেত্রে ইসলামের কতিপয় বিধানে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে না । কিন্তু এগুলো হচ্ছে শাখা – প্রশাখা; যে সব বিষয় উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং স্বাধীনতার মূল (যেমন- মানবাধিকার , বাকস্বাধীনতা , নাগরিক অধিকার) তার প্রত্যেকটিই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং পদদলিত করা হয়েছে । মসজিদসমূহ বেপরোয়াভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, জনগণের

নাগরিক স্বাধীনতা খতম করে দেয়া হয়েছে । এমন কি মুসলমান হোক কি হিন্দু – পাসপোর্ট ও পারমিট ব্যতীত কাউকে শহরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। সাধারণ প্রবাসী ও ব্যবসায়ীদেরকে শহরে আসা – যাওয়ার অনুমতি দানও দেশের স্বার্থে কিংবা জনগনের নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থেই দেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন সুজাউল মুলক, বেলায়েতী বেগম প্রমুখ ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া বাইর থেকে প্রবেশ করতে পারছেন না। দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত তাদেরই আমলদারী চলছে। অবশ্য হায়দ্রাবাদ; লক্ষ্ণৌ ও রামপুরের শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ায় সরসরি নাছারাদের আইন সেখানে চালু নেই । কিন্তু এতেও গোটা দেশের উপরই 'দারুল হরবের-ই হুকুম বর্তায়।" - ফতওয়ায়ে আজীজী (ফারসী) , ১৭ পৃঃ মুজতাবীয়া প্রেস ।

এ ভাবে শাহ্ আবদুল আজীজ দেহলভী অন্য একটি ফতওয়ার মাধ্যমে ভারতকে 'দারুল হরব' "শত্রুদেশ বলে" বলে ঘোষণা করেন। ফতওয়ার ভাষায় 'দারুল হরব' পরিভাষা ব্যবহারের মূল লক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক ও স্বাধীন সংগ্রামের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করা । যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, " আইন রচনার যাবতীয় ক্ষমতা খৃষ্টানদের হাতে , তারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে হরণ করেছে। কাজেই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হলো বিদেশী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এখন থেকে নানানভাবে সংগ্রাম করা এবং লক্ষ্য অর্জনের আগ পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

ইংরেজ বিরোধী ফতওয়ায় প্রতিক্রিয়া

সাধারণ মুসলমানগণ এযাবত ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতাপের সামনে নিজেদেরকে অসহায় মনে করতেন এবং নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এ ফতওয়া প্রকাশের পরই মুসলমানরা কার্জনীতি নির্ধারণের পথ খুঁজে পায়। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও তার বিশিষ্ট ছাত্রবৃন্দের দ্বারা

উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মুসলমানের নিকট এই বিপ্লবী ফতওয়ার বাণী প্রচারিত হয় । আর এমনিভাবে মুসলমানদের মনে ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী ভাব জাগ্রত হতে থাকে ।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, শাহ্ আবদুল আজিজেরই শিষ্য সাইয়েদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা মওলানা আবদুল হাই ও ভ্রতুষ্পুত্র মওলানা ইসমাইল শহীদের সেনাপতিত্বে (আনু: ১৮১৭ খৃ:) বিরাট মোজাহেদ বাহিনী গঠিত হয় । এই মোজাহিদ বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (শিখ ও ইংরেজ) বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে পূর্ব-ভারত কিংবা দক্ষিণ অথবা উত্তর ভারতে কোন স্থানকে নিরাপদ মনে না করে পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পেশোয়ার–কাশ্মীর এলাকায় নিজেদের কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের এ আন্দোলন ও সংগ্রামে উপমহাদেশের পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহ, (কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, মোমেনশাহ প্রভৃতি) থেকেও মুসলমানরা যোগদান করেছিল।

বাংলাদেশে সাড়া জাগলো

শাহ্ আবদুল আজীজের এই ইসলামী আন্দোলন ও উক্ত ফতওয়ার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সাড়া জেগেছিলো । যার ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলনের নামে এক শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন গড়ে ওঠে । তার সামান্য কিছুদিন পরেই মোজাহিদগণের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বাংলার মওলানা তীতুমীর (হাজী সাইয়েদ নেসার আলী) ও তার সঙ্গীরা এখানে বহু স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন । মাওলানা তিতুমীর ছিলেন শহীদ বালাকোট সাইয়েদ আহমদ শহীদের একনিষ্ঠ শিষ্য । তিনি ১৮৩১ খৃ. সাইয়েদ সাহেব যে সালে বালাকোটে

শাহাদাত বরণ করেন, ঐ সালেই ইংরেজ দোসরদের সঙ্গে জেহাদে শহীদ হন ।

ফরায়েজী আন্দোলনের শেষের দিকে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীও সাইয়েদ আহমদ শহীদের শিষ্য হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা – সংস্কৃতি ও আদর্শ প্রচারে বিরাট কাজ করেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের জীবন থেকে হিন্দুয়ানী তথা বিজাতীয় শিক্ষা – সংস্কৃতির প্রভাব দূরীকরণ ও এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীর অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । মূলত এ কারণেই এখনও বাংলার প্রতিটি মানুষ “হাদিয়ে বাঙ্গাল” মওলানা কারামত আলী জৈনপুরীকে অতি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে ।

সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর আন্দোলন

মোজাহিদ বাহিনীর নেতা সাইয়েদ আহমদ শহীদ জেহাদের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে তার শত শত কর্মীকে নিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পবিত্র হজ্জ পালনের লক্ষ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন । ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । স্বদেশে ফিরে তিনি ইসলামী আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তার দলের প্রতিটি মোজাহিদকে তিনি ইসলামের সোনালী যুগের আন্দোলনের কর্মী সাহাবীদের আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করেন। তাদের রাত্রদিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো ভোরে প্রচারকার্য, দিবা ভাগে দৈনিক কঠোর পরিশ্রম, রাত্রির একাংশে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতে জাগরণ– এসব ছিলো এই খোদাভক্তদের দৈনন্দিন সাধারণ কর্মসূচী। ইসলামের খাঁটি গণতান্ত্রিক নিয়মে তারা মসজিদ চত্বরে মেঝেয় সকলে সম্মিলিতভাবে খানাপিনা করতেন।

প্রস্তুতি পর্বে সাইয়েদ সাহেব দেশের প্রভাবশালী মুসলমানদের সাথেও যোগাযোগ করেন । নবাব সোলায়মান জা’কে লিখিত তাঁর একটি পত্র পাওয়া যায় । ঐ পত্র থেকে তাঁর আন্দোলনের

মুখ্য উদ্দেশ্য পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। পত্রটি হলো, "আমাদের দুর্ভাগ্য, হিন্দুস্থান কিছুকাল হয় খৃষ্টানদের শাসনে এসেছে এবং তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে জুলুম নিপীড়ন শুরু করেছে। বেদআ'তে দেশ ছেয়ে গেছে এবং ইসলামী আচার–আচরণ ও চালচলন প্রায় উঠে যাচ্ছে । এসব দেখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে । আমি জেহাদ অথবা হিজরত করতে মনস্থির করেছি ।"

সাইয়েদ আহমদের নেতৃত্বে মুক্তি সেনারা এগিয়ে চল্লো

সাইয়েদ আহমদ বেরলভী বেশ হৃদয়ঙ্গম করছিলেন এবং বারবার প্রচার করছিলেন যে, প্রকৃত মুসলিম সমাজ সংগঠন করতে হলে শক্তি ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে সীমান্তে কাজ শুরু করেন যে, আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করতে হলে শত্রু থেকে দূরে একটি স্বাধীন এলাকার দরকার। তাছাড়া তিনি ভেবেছিলেন, সীমান্তের যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলো তাঁর সহায়ক হবে ।

এভাবে অবিভক্ত ভারতের সর্বত্র জেহাদের প্রস্তুতি ও প্রচারণা শেষ করে সাইয়েদ আহমদ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রায়বেরিলী ত্যাগ করেন। সাইয়েদ সাহেবের সঙ্গে এ সময় মোজাহিদের সংখ্যা ছিলো ১২ হাজার ; অল্প দিনের মধ্যেই তা এক লক্ষে উন্নীত হয় । তারা গজনী কাবুল ও পেশোয়ারের পথে নওশেরায় হাজির হলে পর শিখদের সাথে সংঘর্ষ বাধে । উল্লেখ্য, শিখগণ ঐ সময় রণজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করে মুসলমানদের উপর অকথ্য জুলুম অত্যাচার চালাচ্ছিল । এ অত্যাচারের পেছনে ইংরেজদেরও উস্কানি ছিলো । যা হোক, উক্ত সংঘর্ষে মাত্র ৯ শত মোজাহিদদের সাথে বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্য পরাজয় বরণ করলো। সারা সীমান্ত প্রদেশ মুজাহিদদের প্রশংসামুখর হয়ে উঠলো । কিছুদিন পর শের সিংহ ও জনৈক ফরাসী জেনারেলের অধীন প্রায় তিরিশ হাজার শিখ

সৈন্য পুনরায় মুজাহিদদের মোকাবেলা করতে আসে। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে আসলে শিখরা পনজতারে পিছু হটে যায় এবং সেখান থেকে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদদের এই বিরাট সাফল্য জনগণের উপর মস্তবড় প্রভাব বিস্তার করে ।

পেশোয়ার অধিকার

পেশোয়ারবাসী সাইয়েদ আহমদকে সামগ্রিকভাবে শিখদের উপর হামলা করতে আহ্বান জানায় । ঐ সময় গরহিমাজির দশ হাজার যুদ্ধপ্রিয় লোক সরওয়ার জা'র অধীন সাইয়েদ সাহেবকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে। মোজহিদগনের সংখ্যা তখন সর্বমোট এক লক্ষে উপনীত হয় । এদিকে রণজিৎ সিং কতিপয় মুসলিম সরদারকে হাত করার জন্যে মুক্ত হস্তে অর্থ বিলি শুরু করলো এবং আরো নানাভাবে তাদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চালালো । শেষ পর্যন্ত মোজাহিদ বাহিনীকে তিনটি শক্তির মোকাবেলা করতে হলো – শিখ , পেশোয়ারের বিশ্বাসঘাতক সর্দারবৃন্দ এবং খুবী খাঁ। বালাকোটের লড়াইর আগ পর্যন্ত শিখদের সাথে কয়েকটি সংঘর্ষেই সাইয়েদ আহমদকে লিপ্ত হতে হয় । প্রায় সবগুলোতেই শিখরা মুজাহিদদের হাতে পরাজিত হয় । সাইয়েদ সাহেবের এক পত্র থেকে জানা যায় যে , শেষ পর্যায়ে মোজাহিদের সংখ্যা ৩ লক্ষে গিয়ে উপনীত হয়েছিল । সাইয়েদ সাহেব ও তার বাহিনী, রণজিৎ সিংয়ের সুশিক্ষিত খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পেশোয়ার অধিকার করে নেন (১৮৩০ খৃ:) ।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

অতঃপর তিনি কাশ্মীরে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু আম্বের পায়েন্দা খাঁ বাধা দিতে চেষ্টা করলে মোজাহিদ বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ শাহ্ ইসমাইল আম্ব অধিকার করেন এবং সেখানে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন । আম্ব থেকে মর্দান পর্যন্ত বিশাল এলাকায় তার অধিকার স্বীকৃত হলো । সাইয়েদ আহমদ

সেখানে ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলে । তিনি অধিকৃত এলাকায় মওলানা সাইয়েদ মযহার আলীকে কাজী বিচারক নিযুক্ত করলেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পণ করলেন কাবুলের আমীর দোস্ত মুহাম্মদের ভ্রাতা সুলতান মুহাম্মদের উপর।

ইংরেজ ও বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রঃ শাহাদাতে বালাকোট

নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সাইয়েদ আহমদ পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজ কবলিত সাবেক 'দারুল ইসলাম ভারত' পুনরুদ্ধারের জন্যে আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। কিন্তু অপর দিকে যুদ্ধে পরাজিত রণজিৎ সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণে তৈরী হচ্ছিলেন । এই উদ্দেশ্যে রনজিৎ শঠতার আশ্রয় নিলেন। অর্থের লোভে দেখিয়ে সীমান্তের পাঠান ও উপজাতীয়দেরকে সাইয়েদ আহমদের দলছাড়া করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। সাইয়েদ আহমদ ছিলেন কুসংস্কার – বিরোধী । ফলে এ সব পাঠান ও উপজাতীয় লোকদের কেউ কেউ অর্থ লোভে বা কুসংস্কার বশতঃ অকপটে এ আন্দোলনকে গ্রহণ করতে পারেনি । অপর দিকে ইংরেজরাও এই উদীয়মান শক্তি সম্পর্কে ছিলো শঙ্কিত । তারা ঐ সময় ভারতের ঐ অঞ্চল নিয়ে তত মাথা না ঘামালেও শিখদের দ্বারা মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মোজাহিদ বাহিনী এবার দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়ে পড়লো । উপজাতীয় অনেক পাঠান সরদার শিখদের অর্থলোভ সংবরণ করতে না পেয়ে সাইয়েদ আহমদের দল ত্যাগ করলো। অপরদিকে উপজাতীয়দের অনেকে সাইয়েদ আহমদের কুসংস্কার বিরোধী কাজে তাঁর প্রতি অহেতুক অশান্ত হয়ে পড়ে। তারা যেসব বেদআত কাজে লিপ্ত ছিল, মুজাহিদ নেতা সে সবের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কিন্তু তাতেও সংগ্রামী সাইয়েদ আহমদ হতোদ্যম না হয়ে ন্যায় ও সত্যের বার্তাকে সমুন্নত রাখতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করতে

থাকলেন। যুগপৎভাবে বেদআত শির্কের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকের মতে কৌশলগত কারণেই সাইয়েদ সাহেবের ঐ সময় এ থেকে বিরত থাকা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে নিজের কাজ করেই যান। অতঃপর বিশ্বাসঘাতকরাসহ প্রতিপক্ষ বাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাতেও তিনি ভীত না হয়ে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বালাকোট নামক স্থানে শিখদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে খুবি খাঁ নামক এক পাঠানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মওলানা শাহ্ ইসমাইল দেহলভী শাহাদাত বরণ করেন। (১৮৩১ খৃ.)[68]

।।। ২১ ।।।

সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ সম্পর্কে আমি নগণ্যের কিছু কথা

السَّيِّدُ الإِمَامُ المُجَاهِدُ أَحْمَدُ بْنُ عِرْفَانَ الشَّهِيْدُ

নামে আরবী একটি প্রবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে ধরছি।

السَّيِّدُ الْإِمَامُ الْمُجَاهِدُ فِيْ سُطُوْرٍ:

السَّيِّدُ الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ أَحْمَدُ بْنُ عِرْفَانَ الشَّهِيْدِ كَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ سَيِّدِنَا الإِمَامِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[69] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ مِنْ خُلَفَاءِ الإِمَامِ الشَّاه عَبْدِ العَزِيْزِ فِيْ التَّصَوُّفِ، وُلِدَ صُوْفِيًّا وَعَاشَ صُوْفِيًّا وَاسْتُشْهِدَ صُوْفِيًّا ، بَلْ كَانَ الإِمَامُ المُجَاهِدُ إِمَامَ الطَّرِيْقَةِ الصُّوْفِيَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ السُّنِّيَّةِ فِي زَمَنِه، نَعَمْ كَانَ مِمَّنْ يُبَايِعُوْنَه عَلى الْجِهَادِ مِنَ

---

৬৮ জুলফিকার আহমাদ কিসমতি, *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভুমিকা*, ঢাকা: প্রফেসর'স বুক কর্নার, ২০০০, পৃ. ১৫-২২

69 إذا هبت ريح الإيمان للسيد أبي الحسن علي الندوي باللغة البنغالية / صفحة 12-13

الْعُلَمَاءِ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيْلُ الدِّهْلَوِيُّ[70] حَفِيْدُ الإِمَامِ الشَّاه وليِّ اللهِ الدِّهْلَوِيِّ ، الَّذِيْ (الشَّيْخُ إِسْمَاعِيْلُ) تَأَثَّرَ بِالدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ الْوَهَّابِيَّةِ شَيْئًا مَّا ، فَالْتَحَقَ بِه بَعْضُ السَّلَفِيَّةِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا السَّيِّدَ الإِمَامَ المُجَاهِدَ لِلْجِهَادِ وَشَارَكُوْا فِيْهِ[71] عِلْمًا بِأَنَّ السَّلَفِيَّةَ الْوَهَّابِيَّةَ أَصْلًا كَانُوْا ضِدَّ الْجِهَادِ[72] بَلْ كَانُوْا مِنْ مُؤَيِّدِيْ الاسْتِعْمَارِ ، مِثْلَ الشَّيْخِ أَحْمَدَ رِضَا خَانْ[73] [74]، وَبَعْدَ شَهَادَةِ الإِمَامِ وَكَثِيْرٍ مِّنْ أَتْبَاعِه مِنَ العُلَمَاءِ وَ العَامَّةِ فِي مَعْرَكَةِ بَالَاكُوْتَ التَّارِيْخِيَّةِ سَيْطَرَ السَّلَفِيَّةُ الوَهَّابِيَّةُ الحَرَكَةَ الجِهَادِيَّةِ الَّتِيْ قَادَهَا السَّيِّدُ الإِمَامُ المُجَاهِدُ ، وَاحْتُلَّتِ الحَرَكَةُ بِبَرَكَةِ الاسْتِعْمَارِ فَخَالَفَهُمْ عُلَمَاءُ الْأَحْنَافِ كَمَا أَوْضَحَ المُؤَرِّخُ الْبروفيسر وَالْبَرْلَمَانِيُّ البَاكِسْتَانِيُّ اشْتِيَاقُ حُسَيْن القُرَيْشِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الْمَعْرُوْفِ " العُلَمَاءُ فِيْ السِّيَاسَةِ "[75]

وَظَلَّ الوَهَّابِيَّةُ مُسَيْطِرًا عَلى الحَرَكَةِ الجِهَادِيَّةِ إلى أنْ سُمُّوا بِأهْلِ الحَدِيْثِ بِقَرَارٍ رِئَاسِيٍّ اسْتِعْمَارِيٍّ.

وَهذِه هِي نُقْطَةُ الالْتِبَاسِ لِبَعْضِ الكُتَّابِ وَالمَشَائِخِ فِيْ تَوَجُّهِ السَّيِّدِ الإمَامِ المُجَاهِدِ.

وَلَعِبَ الدَّوْرَ الأَسَاسِيَّ المُؤَرِّخُ الْبِرِيْطَانِيُّ الكَذَّابُ هَانْتَرْ فِيْ تَلْبِيْسِ الحَرَكَةِ الجِهَادِيَّةِ الَّتِيْ قَادَهَا السَّيِّدُ الإِمَامُ المُجَاهِدُ بِالدَّعْوَةِ الْوَهَّابِيَّةِ فِيْ كِتَابِه "المُسْلِمُوْنَ فِيْ الهِنْدِ" الَّذِيْ صَدَرَ أَثْنَاءَ مُحَاكَمَةِ

[70] إسماعيل بن عبد الغني بن وَلي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي المعروف بمولانا شاه محمد إسماعيل شهيد (12ربيع الآخر 1193 ھ 29 /أبريل 1779م — 24 ذو القعدة 1246 ھ 6 /مايو 1831م)

[71] العلماء في السياسة / صفحة 171

[72] الاقتصاد في مسائل الجهاد لأبي سعيد محمد حسين لاهوري / الجزء الأول / صفحة 25

[73] إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام / الشيخ أحمد رضا خان / صفحة 10 / صبعة دعوت إسلامي

[74] فتاوى رضوية / الشيخ أحمد رضا خان / الجزء الرابع عشر / صفحة 114

[75] العلماء في السياسة / صفحة 171

قَادَةِ الجِهَادِ فِيْ مَحَاكِمَ اسْتِعْمَارِيَّةٍ[76]، وَهذَا الْمُؤَرِّخُ الْكَذَّابُ كَتَبَ فِيْ كِتَابِه الْمَذْكُوْرِ أَنَّ الْوَهَّابِيَّةَ الْعَرَبَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ[77]، وَهؤُلَاءِ الْمُتَّهَمُوْنَ الْمُحَاكَمُوْنَ هُمُ الْوَهَّابِيَّةُ فِيْ الْهِنْدِ لِلتَّفْرِيْقِ بَيْنَ صُفُوْفِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَنَجَحَ الظَّالِمُ وَقُتِّلَ المَظْلُوْمُوْنَ، مِنْهُمْ مَنْ صُلِبَ وَمِنْهُمْ مَنْ شُرِّدَ إِلى بُحَيْرَةِ أَنْدَمَانَ، وَظَلَّ بَعْضُ المُسْلِمِيْنَ سَاكِتِيْنَ لِأَنَّهُمْ وَهَّابِيَّةٌ لَايُؤْمِنُوْنَ بِرِسَالَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ!! وَلِلْمَزِيْدِ مِنَ المَعْلُوْمَاتِ يُرْجَى مُرَاجَعَةُ الْكِتَابِ لِلْقُرَيْشِيِّ

نَعَمْ، كَانَ السَّيِّدُ الإِمَامُ الْمُجَاهِدُ ضِدَّ الْخُرَافَاتِ بِاسْمِ الدِّيْنِ فِيْ زَمَانٍ أَصْبَحَتِ الْعَادَاتُ وَالتَّقَالِيْدُ عِبَادَاتٍ، وَالْمُحْدَثَاتُ وَالْجَهَالَاتُ رَوْحَانِيَّاتٍ، وَفِيْ بُقْعَةٍ أَصْبَحَ الْمَعْرُوْفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوْفاً.

وَكُفِّرَ هذَا الإِمَامُ الْجَلِيْلُ الْمُجَدِّدُ المَظْلُوْمُ بِدُوْنِ أَيِّ دَلِيْلٍ قَاطِعٍ وَبِأَيِّ بُرْهَانٍ سَاطِعٍ، ظَلَمَه التَّارِيْخُ وَظَلَمَه الْخَوَنَةُ ، سَيِّدٌ إِمَامٌ مُجَاهِدٌ شَهِيْدٌ يَنْبَغِي أنْ يُكْرَمَ ، وَلكِنِ انْقَلَبَ عَلَيْهِ عُبَّادُ الدُّنْيَا فَيُطَارِدُه التَّكْفِيْرُ حَتَّى بَعْدَ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. وَإِلى اللهِ الْمُشْتَكَى.[78]

ভাবানুবাদঃ

আল-ইমাম, আল-মুজাহিদ সাইয়িদ আহমাদ শহীদ সম্পর্কে কিছু কথা

আল-ইমাম, আল-মুজাহিদ সাইয়িদ আহমাদ বিন ইরফান আশ-শহীদ ছিলেন সাইয়িদুনা ইমাম হাসান বিন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র বংশধর এবং তাসাউফে ইমাম শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ'র একজন অন্যতম খলীফা। সুফী পরিবারে জন্ম, সুফী হিসাবে জীবন যাপন এবং সুফী হিসেবেই শাহাদত। বরং

[76] العلماء في السياسة / صفحة 172

[77] المسلمون في الهند / صفحة 59-60

[78] للمزيد "السيد الإمام المجاهد أحمد بن عرفان الشهيد" في الخطبة الحنفية ، ص 293 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 2021 م

আল-ইমাম, আল-মুজাহিদ ছিলেন সুন্নী সুফী তরীকা তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার ইমাম, তাঁর সময়ে। হ্যাঁ, তাঁর হাতে যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম বাইয়াত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শায়খ ইসমাইল দেহলভী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর নাতি। তিনি (শাহ ইসমাইল) সালাফী ওয়াহাবীবাদের দ্বারা কিছুটা আক্রান্ত হয়েছিলেন, এই সুযোগে যে সব সালাফীরা তাঁদের নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সাইয়িদ সাহেবের হাতে জেহাদের বাইয়াত করেছিল, তারা ইসমাইল দেহলভীর সঙ্গী হয়ে যায়। জেনে রাখা উচিৎ সালাফীরা মূলতঃ জেহাদের বিপক্ষে ছিল, বরং তারা ছিল বৃটিশের সাপোর্টার। যেমন ছিলেন শায়খ আহমাদ রেযা খান। ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে ইমাম এবং তাঁর সাথীদের শাহাদাতের পরে জেহাদ আন্দোলন বৃটিশের মদদে সালাফী ওহাবীরা কবজা করে নেয় । যে কারণে ঐ সময়ের জেহাদ আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিলেন সমকালীন উলামায়ে আহনাফ, যেমন স্পষ্ট করেছেন হিস্ট্রোরিয়ান, প্রফেসর, পাকিস্তান পার্লামেন্টারিয়ান ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী তাঁর বিখ্যাত '*উলামা ইন পলিটিক্স*' বইতে।

বৃটিশ সরকারের অধ্যাদেশে আহলে হাদীস নাম ধারন করার পূর্ব পর্যন্ত জেহাদ আন্দোলনকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল ওহাবীরা।

সাইয়িদ আহমাদ শহীদের মিশন সম্পর্কে এই পয়েন্টে অনেক লেখক ও মাশায়েখ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছেন। মূল কাজটি করেছে মিথ্যুক বৃটিশ রাইটার হান্টার। সে জেহাদ আন্দোলনকে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে তার '*দি ইন্ডিয়ান মুসলমান*' বইতে। এই বইটি জেহাদ আন্দোলনের নেতাদের যখন বিচারের নামে প্রহসন চলছিল, ঐ সময় বাজারে আসে। এই মিথ্যুক লেখক তার বইতে লিখেছে, ওহাবীরা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার রিসালাতে বিশ্বাস করে না, এবং আসামীরা ঐ ওহাবী। তার

উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা। সে সফল হল আর মাজলুমদেরকে হত্যা করা হল। তাঁদের মধ্যে অনেককে ফাঁসি দেয়া হল, আরো অনেককে নির্বাসন দেয়া হল আন্দামানে। কিছু সংখ্যক মুসলমান নীরবতা পালন করলেন যেহেতু ওরা ওহাবী, রাসূলের রিসালত বিশ্বাস করে না। বিস্তারিত জানতে কুরাইশীর বইটি পড়তে পারেন।

হ্যাঁ, সাইয়িদ আল- ইমাম দ্বীনের নামে নানান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন, এমন একটি জামানায় যেখানে নানান কালচারকে ইবাদত মনে করা হতো, মূর্খতা ও ভন্ডামীকে বিশ্বাস করা হতো রুহানিয়াত, এবং এমন এক ভুখন্ডে যেখানে ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বিবেবেচনা করা হতো।

এই মহান ইমামকে কাফের ফতোয়া দেয়া হয়েছে অকাট্য কোন প্রমাণ ছাড়া, ইতিহাস তাঁকে জুলুম করল, জুলুম করল খেয়ানতকারীরাও। একজন সাইয়িদ, একজন ইমাম, একজন মুজাহিদ, একজন শহীদ, যাকে উচিৎ ছিল সম্মান দেয়া, কিন্তু দুনিয়া-পূজারীরা তাঁর বিরোধিতায় ব্যস্ত হয়ে গেল এবং শাহাদাতের পরও তাকফীরের ফতোয়া তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

।।। ২২ ।।।

ইতিহাসের বালাকোট : উপমহাদেশের আযাদি আন্দোলনের প্রেরণাঃ ওলিউর রহমান

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ শায়খ আহমাদ সারহিন্দীর রক্ত ও আদর্শের উত্তরসূরী উপমহাদেশের ইসলামি চেতনার অন্যতম বাতিঘর শাহ ওলিউল্লাহ রহঃ মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্বের সংকট দেখে তা থেকে উত্তরণের জন্য যে সুদূরপ্রসারী বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন দিল্লিতে, ১৮৩১ সালের ৬ মে খাইবার-

পাখতুনখোয়ার বালাকোট ময়দানে মর্দে মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহমাদের শাহাদাতের মাধ্যমে তার আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে।
অবশ্য ঊনিশ শতকের শুরুর দিকে সাইয়েদ আহমাদ শহীদের 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলনের হাত ধরে সমাজের অভ্যন্তরে গেঁড়ে বসা শিরক-বিদ'আতী কার্যক্রম প্রতিহত করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও উপমহাদেশের আযাদীর জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রথম সংঘটিত হওয়া বালাকোট ময়দানের এই যুদ্ধই পরবর্তীকালে শামেলির জিহাদ, সিপাহী বিদ্রোহ ও রেশমী রুমাল আন্দোলনের প্রেরণা যুগিয়েছে।
বংশ পরম্পরায় আলী রা.-এর উত্তরপুরুষ বলে খ্যাত সাইয়্যেদ আহমাদ জন্ম গ্রহণ করেন ১৭৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর অযোধ্যার রায়বেরেলিতে। শাহ ইসহাক দেহলভীর কাছ থেকে হাদীস, তাফসীর, ফিকহের ইলম হাসিল করেন। পরে শাহ ওলিউল্লাহর কর্ম ও চেতনার উত্তরাধিকারী স্বস্তে লিখিত সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার ফতোয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণাকারী শাহ আবদুল আযীয রহ. থেকে জিহাদ ও তাসাউফের বায়আত গ্রহণ করেন।
ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা, বিভিন্ন স্থানে শিখ ও মারাঠাদের অব্যাহত যুলুম, লুঠতরাজ দেখে ভারতবর্ষে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এবং স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' এর ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কৌশলগত কারণে তিনি উত্তর ভারতের প্রান্তিক এলাকাগুলো বেছে নেন তাঁর আন্দোলনের গতি সঞ্চার করার জন্য।
এর আগে হজ্বের উদ্দেশ্য চারশতাধিক লোক নিয়ে মক্কায় সফর করেন। পথে পথে বিভিন্ন এলাকায় যাত্রাবিরতি করলে স্থানীয় লোকেরা তাঁর থেকে জিহাদ ও তাসাউফের বায়আত নেন। বাঁশের কেল্লা আন্দোলনের তিতুমীর, ফরায়েজি আন্দোলনের

হাজী শরিয়তুল্লাহসহ বাংলা অঞ্চলের অনেকেই এ সফরকালে সাইয়্যেদ আহমাদ রহ. থেকে দাওয়াত ও জিহাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এদের অন্যতম প্রধান ছিলেন নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী। আরও রয়েছেন চট্টগ্রাম মিরসরাইয়ের শায়খ সুফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রাহ., সাতকানিয়ার মাওলানা আব্দুল হাকীম, কুষ্টিয়া-কুমারখালীর মাওলানা কাজী মিয়াজান, বালাকোট শহীদ মৌলভী আলীমুদ্দীন, ময়মনসিংহ-ত্রিশালের মাওলানা গাজী আশেকুল্লাহ, মাওলানা লুৎফুল্লাহ শহীদ, মৌলভী আলাউদ্দীন বাঙ্গালী, মাওলানা আশরাফ আলী মজুমদার, মাওলানা মুহাম্মাদ মনীরুদ্দীন, মাওলানা আমীনুদ্দীন, শায়খ হাসান আলী, মুন্সি ইবরাহীম শহীদ, সাইয়েদ মুযাফফর শহীদ, মৌলভী করীম বখশ শহীদ, হাজী বদরুদ্দীন, মাওলানা আজীমুদ্দীন ও মাওলানা আশরাফ আলী রহ. প্রমুখ।
মুজাহিদ সংগ্রহের কাজ সাইয়্যেদ সাহেব হজ্বের সফরকালেই করেছিলেন। নিজ শায়েখ শাহ আবদুল আযীযের ভাতিজা শাহ ইসমাঈল, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা খায়রুদ্দীনের মতো ভারত-বিখ্যাত আলেমগণও তাঁর হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন। মুজাহিদদের নিয়ে সাইয়্যেদ সাহেব আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হন। সেখানকার নিপীড়িত জনগণ বারবার পত্র পাঠিয়ে তাদের মুক্তির জন্য সায়্যিদ সাহেবকে দাওয়াত করছিলেন।
কান্দাহার, কাবুল অতিক্রম করে ১৮২৬ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর সায়্যিদ সাহেব খেশগীর নওশহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। স্থানীয় অত্যাচারী শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমে তাকে কর বা জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে বুখ্য সিং সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্ধত হলে সাইয়্যেদ সাহেব সবাইকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। দোয়া ও মুনাজাতের পর মুসলিম বাহিনীর অতর্কিত হামলায় সাতশত শিখ সেনা নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৩৬ জন

ভারতীয় ও ৪৫ জন কান্দাহারী মুজাহিদ নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন। এই যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই মুসলমানদের সাহস, আগ্রহ-উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়।

এরপর শিখ ও ইংরেজদের সাথে মুজাহিদদের আরো কয়েকবার যুদ্ধ হয়। ছোট ছোট যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে উত্তর ভারতের আফগান সীমান্তের বড় একটা অঞ্চল মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। ইসলামি শাসন বাস্তবায়নের জন্য সেখানে কাযী নিয়োগ দেয়া হয়।

সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইংরেজ ও শিখরা কূটচালের আশ্রয় নেয়। নানা প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় খান ও পাঠানদের অনুগত করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেয়। এক রাতেই বিভিন্ন এলাকায় নিয়োজিত পঞ্চাশোর্ধ কাযীকে গলা কেটে হত্যা করা হয় এবং অনেক মুজাহিদকে ছলচাতুরি করে শহিদ করে দেয়া হয়। আহত হৃদয়ে সাইয়্যেদ সাহেব আফগান অঞ্চল ছেড়ে কাশ্মীরের দিকে যেতে মনস্থ করলেন। দূর্গম সব পথ বরফাবৃত পর্বত ডিঙিয়ে বালাকোট নামক স্থানে পৌঁছুলে রণজিৎ সিং- এর স্বসৈন্যে আগমনের সংবাদ পান।

উচ্চ পাহাড়ঘেরা দূর্গম ঐতিহাসিক বালাকোট শহরটি পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খাইবার-পাখতুনখাওয়ার (সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) হাযারা অঞ্চলভুক্ত মানসেহরা জেলা থেকে ৩৮ কি. মি. পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত।

স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদ নিয়েই সাইয়্যেদ সাহেব দৃঢ়তা, অসীম সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। কুনহার নদীর তীরে বালাকোট আগমনের পথে সশস্ত্র পাহারাদার বসান। কিন্তু এবারও বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বালাকোট পৌঁছার গোপন সহজ সমতল পথের সন্ধান শিখ বাহিনী পেয়ে যায়। এমনকি মুজাহিদদের সৈন্য সংখ্যা, রসদ সামগ্রী, অস্ত্রের মজুদ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কেও শিখ বাহিনী আগাম সব তথ্য পেয়ে যায়। যেসব খান পাঠানরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য দাওয়াত করে

সায়্যিদ সাহেবকে তাদের এলাকায় নিয়ে এসেছিল, তারাই পরে অর্থের লোভে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে শিখদের সাথে যোগ দেয়।

দশ হাজার শিখ, পাঠান ও অস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজদের মোকাবেলায় মুজাহিদ ছিলেন সাকুল্যে ৭০০ জন। তবুও শাহ ইসমাঈল, মাওলানা খায়রুদ্দীন তাদের বাহিনী নিয়ে লড়ে যান প্রাণপনে। এক হাজারের মতো শিখ সেনা নিহত হয়। মুজাহিদদের শহিদ হন ৩০০ জন। যুদ্ধে সাইয়্যেদ আহমদ সামনে থেকে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তিনদিক ঘেরাও করে তীর গুলি নিক্ষেপ করতে করতে যখন শিখদের আরো সৈন্য যুদ্ধে শরিক হয় তখন পরাজয় নিশ্চিত জেনে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সায়্যিদ সাহেব হাদিসে বর্ণিত 'আততাওয়াল্লি ইওমায যাহাফ' স্মরণ করে শাহাদাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। যুদ্ধে শাহ ইসমাঈলও শহীদ হন।

সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর এ আন্দোলন ইতিহাসে পরিচিত জিহাদ আন্দোলন নামে। বালাকোট আন্দোলনও বলা হয়। বলা হয়- ইংরেজ বিরোধি প্রথম আজাদি আন্দোলন। আরও কোনো কোনো নামেও ডাকা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংঘটিত বালাকোটের এ আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ছোট-বড় প্রতিটি সংগ্রামকেই প্রেরণা যুগিয়েছে। আল্লাহ বালাকোট ময়দানে শহীদদের মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করুন।[79]

।।। ২৩ ।।।

আহমাদ শাহীদ, সায়্যিদ বেরীলবী – ই. বিশ্বকোষ

সায়্যিদ আহমাদ শাহীদ (سيد احمد شهيد برلوى) ইবনে সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইরফান, জ. ৬ সাফার, ১২০১/২৮ নভেম্বর, ১৭৮৬ সালে (অযোধ্যায়) রায়বেরেলী-তে।

---

[৭৯] Islamtimes24.com, ৬ মে ২০১৯

(সায়্যিদ মুহাম্মদ য়া'কূব সাহিবের ভ্রাতা, ওয়াকাই আহমাদী) মৃ. ২৪ যু'ল-কা'দাঃ ১২৪৬/৬ মে. ১৮৩১ বালাকোট ও মিট্রী কোটের মধ্যবর্তী ময়দানে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁহার বংশানুক্রম ছত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বে আমীরু'ল-মু'মিনীন 'আলী (রা.)-র সহিত মিলিত হয়। (হাসানী) সায়্যিদগণের এই বংশ সুলতান শামসু'দ-দীন ইলতুতমিশের শাসনামলে ভারতে আসেন এবং কড়া মানিকপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাকওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাহারা প্রতি যুগেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কেহ কেহ সরকারী পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে তাঁহাদের বাসস্থান পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাহমান 'আলী (তায্-কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ.৮১) তাঁহার বংশকে রায়বেরেলী-র নেতৃস্থানীয় পরিবার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাহ 'আলামুল্লাহ (মৃ. ১০৯৬ হি.) সম্রাট শাহজাহান ও 'আলমগীরের শাসনামলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গণ্য হইতেন। তিনি ছিলেন সায়্যিদ আহ'মাদের পিতৃ ও মাতৃ বংশের উর্ধ্বতন ৪র্থ পুরুষ (সীরাত 'আলামিয়্যাঃতায-কিরাতু'ল-আবরার)।

সায়্যিদ আহ'মাদ স্বীয় গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যার্জনে তাঁহার তেমন মনযোগ ছিল না। শক্তি ও নেতৃত্বব্যঞ্জক খেলাধুলার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল (মাখযান আহ'মাদী)। তিনি সমবয়স্ক বালকদের সমন্বয়ে সৈন্যদল গঠন করিতেন এবং জিহাদের অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়া কল্পিত শত্রু সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করিতেন । এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে জিহাদের আগ্রহ প্রবল ছিল (মানজূরাঃ)। তাঁহার দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করিতেন। প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদের সেবায় অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাদের জন্য পানি ও বন-জঙ্গল হইতে ইন্ধন আনয়ন করিয়া দিতেন। কেহ আপত্তি করিলে তিনি অভাবী ও মিসকীনদের সেবার ব্যাপারে এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য

রাখিতেন যে, শ্রোতাগণ অভিভূত হইয়া পড়িতেন (মাখযান আহ'মাদী)।

যৌবনের প্রারম্ভে চাকুরীর প্রত্যাশী করেকজন বন্ধু ও দেশবাসীসহ তিনি লখনৌ গমন করেন এবং তথায় সাত মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যতগুলি চাকুরী পাওয়া গেল উহাতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে কিতাবী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে শাহ 'আব্দল-'আযীযের নিকট দিল্লী গমন করেন। শাহ 'আবদু'ল-আযীয তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা শাহ 'আবদু'ল-কাদির মুহা'দ্দিছের নিকট আকবার আবাদী মসজিদে প্রেরণ করেন (মাখযান আহ'মাদী) ।

একটি বর্ণনায় মীযান, কাফিয়া ও মিশকাত অধ্যায়নের কথা উল্লেখ আছে (আরওয়াহ' ছালাছা')। সেই সময় তিনি 'ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (আছারুস সানাদীদ, প্রথম সংস্করণ)। সাধনার শুরু হইতেই বৎসরের পর বৎসর 'ইশা ও ফজরের সালাত এক উযুতে আদায় করিতেন (ওয়াসায়া'ল-ওয়াযীর)।

১২২২/১৮০৭ সালে তিনি শাহ 'আবদু'ল 'আযীযের হস্তে বায়া'আত গ্রহণ করেন। শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও হিদায়াতের জন্য কোনরূপ মাধ্যমের মুখাপেক্ষী রাখেন নাই (আছারু'স সানাদীদ)। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় এইরূপ মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে, সামান্য ইঙ্গিতেই অতি উচ্চ স্থানের উপলদ্ধি করিতে পারিতেন (মানজূ'রা)। ১২২৩/১৮০৮ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ই তাঁহার বিবাহ হয়।

ভারতে ইসলামী শাসন ও শারী'আতের আইন-কানুন প্রবর্তন তাঁহার জীবনের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্য ছিল। ইহার জন্য তিনি তাঁহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাময়িক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল নওয়াব আমীর খানই তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে

সাহায্যকারী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিকট বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। অন্যদের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছাড়াও তিনি মধ্যভারতে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে সফল আক্রমণ পরিচালনা করিয়া পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিতেন। বস্তুত সায়্যিদ আহ'মাদ ১২২৪/১৮০৯ সালে নওয়াব আমীর খানের নিকট রাজপুতনায় গমন করেন (মাখযান আহ'মাদী, মানজূরা,ওয়াকাই আহ'মাদী ইত্যাদি)। এই উদ্দেশ্যে তিনি সাত বৎসর নওয়াবের স্বীয় পূর্ণ শক্তি জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে নিয়োজিত রাখিতে পারেন। এই সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সৈন্যবাহিনীতে ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবনের কাজ অব্যাহত রাখেন।

ইংরেজদের জোর তৎপরতায় ১৮১৭ খৃ. হঠাৎ করিয়া নওয়াবের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া টুঙ্ক (Tonk)-এর কর্তৃত্ব লাভ এবং সৈন্যবাহনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে রাযী হন। সায়্যিদ আহ'মাদ তাঁহাকে এই চুক্তি হইতে বিরত রাখিতে একান্ত চেষ্টা করেন। তিনি বারবার বলেন, ইংরেজদের সঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করুন (মানজূরা,ওয়াকাই ইত্যাদি)। কিন্তু ইহা নবাবের সাহসে কুলাইল না। অতএব সায়্যিদ আহ'মাদ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, তথায় তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে জিহাদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনী গঠন করার এবং তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। সেই ব্যাপারে আমীর খান তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন না।

দিল্লীতে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়া যায়, যাঁহাদের মধ্যে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহর পরিবারের দুইজন খ্যাতনামা 'আলিম শাহ ইসমা'ঈল ও মাওলানা 'আবদু'ল-আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র ও দ্বিতীয় জন তাঁহার জামাতা। প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি রোহিলাখণ্ড,

আগ্রা, অযোধ্যার বিভিন্ন শহর ও স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যথা মীরাট, মুজাফফার নগর, সাহারানপুর, মুরাদ আবাদ, 'রামপুর, কানপুর, লখনৌ, বেনারস ইত্যাদি (ওয়াকাই,মানজূ'রা)। ধর্মীয় সংস্কার ও জিহাদের সংগঠন উভয় কাজ একই সাথে চলিতে থাকে। শাহ ইসমা'ঈল ও মাওলানা আব্দুল হায়্যি ক্রমাগত জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াজ করিতে থাকেন। মুসলমানদের মন-মগজে জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহ এত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্যের বিষয় রূপে ভাবিতে থাকেন (আছারু'স সানাদীদ) । আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীতও যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন তাঁহার মরীদদের বিশেষ কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল (ওয়াকাই, আহ'মাদী,মানজূ'রা)। তিনি বিধবা বিবাহে অনুপ্রাণিত করেন। কেননা সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিধবা বিবাহকে অসম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন। অতএব তিনি স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃবধুকে বিবাহ করেন (মাখযান, ওয়াকাই, আহ'মাদী,মানজূ'রা ইত্যাদি)।

সমুদ্রের উপর ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, সমুদ্রপথে ভ্রমণের বিপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, হ'জ্জে যাওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে- ইহার ভিত্তিতে কোন কোন আলিম এমন অবস্থায় হ'জ্জ ফরজ থাকে না বলিয়া ফাতওয়া দেন। কেননা রাস্তার নিরাপত্তা হ'জ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত (ওয়াকাই, আহ'মাদী)। লখনৌ-তে এইরূপ ফাতওয়া দেওয়া হইয়াছে। শাহ ইসমা'ঈল ও মাওলানা আবদু'ল-হায়্যি অকাট্য প্রমাণ সহকারে ইহা খণ্ডণ করেন। হাদীছবিদ শাহ আবদু'ল-আযীয ইহাদের অভিমত সমর্থন করেন(মানজূ'রা)। 'গঢ়' (উত্তর প্রদেশের Kutri -এর নিকটে) নামক স্থানের মাওলাবী য়ার 'আলী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া এমন অবস্থায় হজ্জে যাওয়াকে হারাম বলিয়া ফাতওয়া দেন। তাঁহার মতে এমন অবস্থায় হ'জ্জে যাওয়ার অর্থ

জানিয়া বুঝিয়া জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, যাহা কু'রআনের নির্দেশ (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ''তোমরা নিজের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না'' (২:১৯৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ। এই ভ্রান্ত ধারনাকে কার্যত প্রতিরোধের জন্য সায়্যিদ আহ'মাদ (র.) স্বয়ং হ'জ্জে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং সাধারণভাবে ঘোষণা দেন, মুসলমানগণ হ'জ্জে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে প্রস্তুত হইতে পারেন, আমার সঙ্গে তাঁহারা হ'জ্জ করিবেন- তাঁহার নিকট খরচের অর্থ থাকুক বা না-ই থাকুক (ওয়াকাই,মানজূ'রা ইত্যাদি)। ।

শাওয়াল মাসের শেষ তারিখ, ১২৩৬/৩০ জুলাই, ১৮২১ সালে সায়্যিদ আহ'মাদ প্রায় চারি শত সঙ্গী সহ রায়বেরেলী হইতে হ'জ্জের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় পৌঁছেন। তিন মাস তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে ধর্মীয় অনুভূতির পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার কাজ অব্যাহত ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। অনেক অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেন (মাখযান,ওয়াকাই, আহ'মাদী,মানজূ'রা ইত্যাদি)। তিনি হি. ১২৩৭ সালে বায়তুল্লাহ যিয়ারাত করেন (তাযকিরা-ই উলামা-ই হিন্দ)।

হি'জায যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ৭৩৫ জন মুসলমান হ'জ্জের উদ্দেশে একত্র হইয়াছিলেন। তের হাজার আট শত ষাট টাকার বিনিময়ে দশটি জাহাজ ভাড়া করিয়া তাঁহাদেরকে উঠান হয়। তাহাদের জন্য প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়। হি'জাযে অবস্থান ও ফিরিয়া আসার যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন করেন, অথচ যাত্রার সময় একটি কড়িও তাঁহার সঙ্গে ছিল না। দুই বৎসর দশ মাস পর ২৯ শা'বান, ১২৩৯/২৯ এপ্রিল, ১৮২৪ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন (মাখযান আহ'মাদী,ওয়াকাই, মানজূ'রা)। অতঃপর সম্পূর্ণভাবে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হন।

জিহাদের উদ্দেশ্য এই ছিলঃ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, খৃষ্টানগণ ও মুশরিকদের প্রাধান্যের মূল উৎপাটিত হউক। রাজত্ব, পদমর্যাদা বা ক্ষমতা লাভ ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু আল্লাহর বাণীকে সমুচ্চ করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য (মাকাতীব ওয়া 'আলাম নামাহজাত)। জিহাদের প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। সেই অঞ্চলের জনসাধারণ ছিল মুসলমান। তাহাদের স্বাধীনতা শিখদের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত অঞ্চলের আশেপাশে কয়েকটি মুসলিম রাজ্য ছিল যাহাদের শুভেচ্ছার আশা করা গিয়াছিল। আশা ছিল, পাঞ্জাব অভিযানে সিন্ধু ও ভাওয়ালপুরের মুসলমান রাজ্যদ্বয় সাহায্যকারী হইতে পারে।

৭ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪১/ ১৭ জানুয়ারি, ১৮২৬ সালে সায়্যিদ আহ'মাদ দারু'ল-হা'রব ভারত হইতে হিজরত করেন, যেখানে তিনি জীবনের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। হিজরতের উদ্দেশে তিনি রায়বেরেলী হইতে বাহির হন। প্রথম দলের গাযীদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় শতের মাঝামাঝি ছিল এবং মাত্র পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার হাতে ছিল। রায়বেরেলী হইতে কালগী, গোয়ালিয়ার, টুংক, আজমীর, পালী, অমরকোট, হায়াদারাবাদ (সিন্ধু), পীরকোট, মাহাজী, শিকারপুর, ঢাঢার বুলান, কোয়েটা, কান্দাহার, গযনী, কাবুল এবং জালালাবাদ হইয়া পেশাওয়ার পৌঁছেন। রাস্তায় সাধারণ মুসলমান ছাড়াও সিন্ধু, ভাওয়ালপুর, বেলুচিস্তান, কান্দাহার এবং কাবুলের শাসক, প্রধান নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেন (ওয়াকাই,মানজূ'রা ইত্যাদি)। আমীর দোস্ত মুহা'ম্মাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনের উদ্দেশে পঁয়তাল্লিশ দিন তিনি কাবুলে অবস্থান করেন।

সায়্যিদ আহ'মাদের জিহাদের সংকল্পের কথা শুনিয়া শিখ প্রশাসন বুধ সিংহের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি

বাহিনীকে সীমান্ত প্রদেশের আকুড়ায় প্রেরণ করিয়াছিল। ২০ জুমাদা'ল-উলা, ১২৪২/২০ ডিসেম্বর, ১৮২৬ সালে নয় শত গাযী, যাহাদের মধ্যে ১৩৬ জন ছিলেন ভারতীয়, শিখ সৈন্যবাহিনীর উপর নৈশ আক্রমণ চালাইয়া শত শত শিখ সৈন্যকে হত্যা করেন।

ভারতীয় শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬ । শিখ সৈন্যবাহিনী আকূড়া হইতে কয়েক মাইল পিছনে হটিয়া "শায়দু" নামক স্থানে অবস্থান করে(ওয়াকাই, আহ'মাদী,মাকাতীব,মানজূ'রা ইত্যাদি)।

আকূড়া যুদ্ধে জয়ের ফলে মুসলমানদের অন্তরে আশার আলো দেখা দেয়। ১২ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪২/১১ জানুয়ারী, ১৮২৭ রোজ বৃহস্পতিবাার সীমান্ত অঞ্চলের 'হুড' নামক স্থানে এক বিরাট সমাবেশে 'আলিম ও খানগণ সায়্যিদ আহ'মাদের নেতৃত্বে জিহাদ করার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং মুহা'ম্মাদ, সুলতান মুহাম্মাদ প্রমুখ পেশাওয়ারের অন্যান্য দুররানী সরদারও বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। সায়্যিদ আহ'মাদের প্রচেষ্টায় শায়দূ-তে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রায় এক লক্ষ মুজাহিদ সমবেত হয়। শিখগণ গোপনে গোপনে ভীতিপ্রদ বার্তা প্রেরণ করিয়া করিয়া য়ার মুহাম্মাদকে নিজেদের দলে টানিয়া লয়। যুদ্ধের এক রাত্রি পূর্বেই সায়্যিদ আহ'মাদকে সে বিষ প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পায়।

শিখগণ পিছু হটিতে থাকিলে গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহা'ম্মাদ ও তাহার ভ্রাতা মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ রটাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলাইয়া যায়। এইভাবে গাযীদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয় (ওয়াকাই, আহ'মাদী, মাকাতীব,মানজূ'রা ইত্যাদি)।

সায়্যিদ আহ'মাদ পাঞ্জাতার (খাদ্দ ওয়া খায়ল)-এ কেন্দ্র স্থাপন করেন, বুনীর ও সোয়াতের ভ্রমণ করেন। দলে দলে ভারতীয় মুজাহিদগণের আগমনে তাঁহাদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পেশাওয়ার ও মারদান সমতল ও পাহাড়ী অঞ্চলের বহু লোক তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে। হাযারার বনাঞ্চলে গাযীগণ তামগালা ও শাংকিয়ারী নামক স্থানে শিখদেরকে পরাজিত করেন। এই সময়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু দুররানী নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহাদের প্ররোচনায় অন্য খানরাও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে (ওয়াকাই,মানজূ'রা ইত্যাদি)।

শা'বান ১২৪৪/ফেব্রুয়ারী ১৮২৯ সালে সায়্যিদ আহ'মাদ আড়াই হাজার 'আলিম ও খানদেরকে পঞ্জতার কেন্দ্রে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শারী'আত-এর আইন জারী করার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহাদের দাবি ছিল যে, সীমান্ত অঞ্চলে ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর লোক সকলেই এই পবিত্র আইনের অধীনে একতাবদ্ধ হইয়া একটি জামা'আতে পরিগণিত হইবে; ইহাকে তাঁহারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উৎস বলিয়া মনে করিতেন। হুনড-এর প্রধান খাদে খান শিখদের সহিত মিলিত হইয়া পাঞ্জতার আক্রমণ করে। কিন্তু শিখ সৈন্যদলের সেনাপতি যুদ্ধ করার সাহস করে নাই। সায়্যিদ সাহিব প্রথমে হুনড জয় করেন, অতঃপর যায়দা-র যুদ্ধে দুররানীদের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে য়ার মুহা'ম্মাদ নিহত হন। পূর্বদিকে আমব দখল করেন। ইহার পর (মারদান-এর নিকট) মায়ার-এ সুলতান মুহাম্মাদ ও তাঁহার ভ্রাতাদের বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া মারদান ও পেশওয়ার জয় করেন। সুলতান মুহা'ম্মাদ সন্ধির জন্য আবেদন জানান। সায়্যিদ আহ'মাদ শারী'আতের আইন প্রতিষ্ঠা ও মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দেন। এইভাবে পেশওয়ার হইতে আটক এবং আটক হইতে আমব পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল এক আইনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়

এবং সায়্যিদ আহ’মাদ নিশ্চিন্তে পাঞ্জাব অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন(ওয়াকাই,মানজূ’রা ইত্যাদি)। শিখদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহারা মুসলিম বাহিনীর সহিত সন্ধি করিবেন এবং এই শর্তে আটকের সমগ্র অঞ্চল সায়্যিদ আহ’মাদের অধীনে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তিনি এই প্রস্তাব এইজন্য গ্রহণ করেন নাই যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কোন অঞ্চল দখল অথবা জায়গীর লাভ করা ছিল না, বরং ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শারী’আতের বিধান জারী করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সুলতান মুহা’ম্মাদ দুররানী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেড় শত হইতে দুই শত গাযীকে অতর্কিতে শহীদ করেন- যাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন।সায়্যিদ আহ’মাদের বর্ণনা মুতাবিক ভারতে যাঁহারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই গাযীগণই ছিলেন অন্য সকলের তুলনায় অধিক খাঁটি ও প্রকৃত মুজাহিদ। মাত্র সেই সকল গাযীই বাঁচিয়া যান, যাঁহারা আমব ও পাঞ্জতার-এ আবস্থান করিতেছিলেন অথবা যাঁহারা সংবাদ পাওয়া মাত্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা সায়্যিদ আহ’মাদ দুররানী নেতৃবৃন্দ ও কোন কোন খান-এর ক্রমাগত সন্ধির শর্ত ভঙ্গের ফলে চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন এবং যেই কেন্দ্রে তিনি চারি বৎসর ছিলেন উহা ছাড়িয়া দেওয়া সংগত মনে করেন এবং কাশ্মীরে চলিয়া যাওয়ার সংকল্প করেন, যেখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে ইতিপূর্বে বার বার আহবান আসিয়াছিল। হাযারা, মুজাফ-ফারাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের খানগণ, যাহাদের এলাকা কাশ্মীরের রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সহযোগিতা প্রদান করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। অতএব তিনি দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করিয়া আবাসীন নদী পার হইলেন এবং রাজদাওয়ারী (হাযারার উত্তরাঞ্চল)-এ গিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি গাযী ভূগাঢ় মাঙ্গ, গোনশ এবং

বালাকোটে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মুজাফফারাবাদ (কাশ্মীর) পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন (মানজূরা ওয়াকাই’ ইত্যাদি)। সাহায্যকারী খানগণকে শিখদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ জরুরী বলিয়া মনে করা হইত। এই উদ্দেশে তিনি কিছু দিনের জন্য বালাকোট (মানসাহরাহ তাহ’সীল) অবস্থান করেন (মানজুরা, ওয়াককাই’ ইত্যাদি)।

এই সময় রণজিৎ সিংহের পুত্র শের সিংহ দশ হাজার সৈন্যসহ মানসাহ্রাহ ও মুজাফফারাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিল। হঠাৎ সে গিরিপথ দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত শিখ বাহিনীর এক বড় অংশকে এক সময়ে মিট্টিকোটের টিলায় লইয়া আসিতে সফল হয়, যাহা বালাকোটের ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ২৪ যুল-কাদা, ১২৪৬/৬ মে, ১৮৩১ সালে শুক্রবার চাশতের সময় মিট্টিকোট ও বালাকোটের মধ্যবর্তী ময়দানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শিখদের সৈন্য সংখ্যা গাযীদের সৈন্য সংখ্যার তুলনায় কয়েকগুণ বেশী ছিল। বহু শিখ সৈন্য নিহত হয়।

প্রায় তিন শত গাযী শাহাদাত বরণ করেন। সায়্যিদ আহ’মাদকে গুজররা বন্দী করিয়া পাশের পাহাড়ে লিইয়া যাওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট গাযীগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাঁহার শাহদাতের সংবাদ পরে জানা যায় (মানজূরা, ওয়াকাই’ ইত্যাদি)।

এইভাবে হাযারা জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে এই বীর মুজাহিদ শাহদাত বরণ করেন, অথচ তিনি সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিধর্মীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনাদর্শের উদগ্র প্রেরণা জাগ্রত করেন এবং প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে একটি জামা’আত প্রস্তুত করেন যাহার নমুনা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের পরে খুব কমই পাওয়া যায়।

শিখগণ সায়্যিদ আহ'মাদের মৃতদেহ তালাশ করিল। তখন মস্তক শরীর হইতে খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাহারা উভয় অংশ একত্র করিয়া সসম্মানে মৃতদেহটি দাফন করে (সৌহান লাল সুরী. 'উমদাতু'ত-তাওয়ারীখ, ৩খ, ১,৩৫)। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে একদল শিখ (নাহাঙ্গ) মৃতদেহটি কবর হইতে তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। মস্তক ও দেহ পুনরায় প্রথক হইয়া যায়। দেহটি তালহাট্টা (গাঢ়হী হাবীবুল্লাহ খান হইতে তিন মাইল উত্তরে কানহা নদীর পূর্ব তীরে)-এর কৃষকেরা নদী হইতে তুলিয়া একটি অজ্ঞাত স্থানে দাফন করে (Hazara Gazetteer)।
আজকাল সেখানে তাঁহার কবর আছে বলিয়া করা হইয়া থাকে, যাহা মূলত নির্ভরযোগ্য নহে। মস্তকটি স্রোতের টানে গাঢ়হী হাবিবুল্লাহ নামক স্থানে গিয়া পৌঁছে। সেখানে স্থানীয় খান নদী হইতে উহা উত্তোলন করাইয়া নদীর তীরে উহা দাফন করেন। মানসাহরাহ হইকে মুজাফফারবাদ যাওয়ার পথে পুলের অপর পার্শ্বে বামদিকে কবরটি দৃষ্ট হয় । ১৯৪৮ খৃ. পর্যন্ত কবরটি অতি ছোট ছিল। পরে ইহাকে বাড়াইয়া একটি পূর্ণ কবরের রূপ দান করা হয়। সায়্যিদ আহ'মাদের শাহাদাতের পর তাঁহার একটি ছবি শের সিংহ একটি অভিজ্ঞ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া লাহোরে রণজিৎ সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেয় (জাফার নামা-ই অমরনাথ)। ইহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। সায়্যিদ আহ'মাদ নিম্নোক্ত কয়েকটি পুস্তিকাও রচনা[80] করিয়াছিলেন:

[80] সাইয়িদ আহমাদ শহীদ নিজে কোন পুস্তক রচনা করেননি। উনার বিভিন্ন বয়ানের উপর ভিত্তি করে যে কিতাব রচনা করা হয়েছিল বলে বলা হয় তাও উনার শাহাদাতের পর কতটুকু অক্ষত হিসাবে প্রিন্ট হয়েছে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ব্রিটিশের পলিসি ব্যাপারে যারা সম্যক অবগত আছেন তাঁরাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

(১) তানবীহুল-গাফিলীন (ফারসী), দিল্লী ১২৮৫/ ১৮৬৮, মাত'বা মুহাম্মাদী, লাহোর হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে। দুইবার ইহার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (২) রিসালা-ই নামায (ফারসী), ইহারও উর্দূ অনুবাদ দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। (৩) রিসালা দার নিকাহ' বীওয়াগান (ফারসী), এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।
(৪) সিরাত' মুস্তাকীম (ফারসী), ইহার বিষয়বস্তু তিনি নিজেই বর্ণনা করিতেন। প্রথম অধ্যায়টি মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি মাওলানা 'আবদু'ল-হায়্যি কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। উভয়ই কিছু অংশ লিখিয়া সায়্যিদ সাহেবকে পড়িয়া শুনাইতেন। কোন কোন সময় তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক দুই-তিনবার করিয়া পাঠের পরিবর্তন করা হইত (মানজুরা ওয়াকাই'), কলিকাতা ১২৩৮/১৭৮২৩)। মক্কায় অবস্থানকালে মাওলানা 'আবদু'ল হায়্যি 'আরবীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। (৫) মুলহিমাত আহ'মাদিয়া ফি'ত-তারীকিল-মুহাম্মাদিয়া, আগ্রা ১২৯৯/১৮৮২, কলিকাতা ১২৩৮/১৮২৩।[81]

।।। ২৪ ।।।

চেতনার বালাকোট: শেখ জেবুল আমিন দুলাল

সৈয়দ আহমদের ইসলামী আন্দোলন এবং মুহাম্মদ বিন্ আবদুল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতির সাথে অনেকটা সাদৃশ্য থাকার ফলে অসতর্কতা বশতঃ অনেকেই উপমহাদেশের এ আন্দোলনকেও ওয়াহহাবী আন্দোলন আখ্যা দিয়েছিল। অবশ্য কেউ কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এ আন্দোলনকে ওয়াহহাবী (আন্দোলন বলে থাকেন) তথাকথিত

[81] সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ. ৩, পৃ. ৫৮৬-৫৮৯

ঐতিহাসিকগণও সচেতনভাবেই হোক আর অচেতনভাবেই হোক এই মারাত্মক ভুলটি করেছেন।[82]

।।। ২৫ ।।।

দু'জন আরব লেখকের সাক্ষী

ড. আব্দুল মুনইম তাঁর "তারীখুল ইসলামী ফিল হিন্দ" কিতাবে লিখেন,

سَيِّد أحْمَد بِرِيْلَوِيُّ

الشَّهِيْرُ بِاسْمِ سَيِّد أحْمَد الشَّهِيْد

وُلد في قَرْيَةِ رَايْ بِرِيْلِي ، مِنْ أعْمَالِ لَكْنَوْ فِي غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ 1201 هـ 1786 م مِنْ أسْرَةٍ كَرِيْمَةٍ ، اشْتَهَرَتْ بِالعِلْمِ وَالتَّقْوَى ، وَيَنْتَهِي نَسَبُهَا إلى سَيِّدِنَا الحُسَيْنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهَا[83] ، وَلَمْ تَتَّجِه نَفْسُه إلى التَّعْلِيْمِ بِرَغْمِ حِرْصِ وَالِدِه وَمُعَلِّمِيْه عَلى تَعْلِيْمِه ، حَتَّى إذَا تُوُفِّيَ وَالِدُهُ وَهُوَ فِي السَّابِعَةِ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِه تَرَكَ بَلْدَتَه ، وَسَافَرَ إلى لَكْنَوْ ، وَانْخَرَطَ فِي سِلْكِ الْجُنُوْدِ عِنْدَ أحَدِ الْأمَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَلَمْ يَمْكُثْ طَوِيْلاً ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى دِهْلِي سَنَةَ 1221 هـ 1806 حَيْثُ جَذَبَتْه مَدْرَسَةُ شَاه وَلِيِّ اللهِ ، فَتَتَلْمَذَ عَلَى شَاه عَبْدِ الْقَادِرِ ، وَتَلَقَّى الصُّوْفِيَّةَ مِنْ أخِيْهِ شَاه عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، حَتَّى أتِيَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ مَا تَدْهَشُ لَه الْعُقُوْلُ ، وَهُوَ فِي الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِيْنَ 1222 هـ . 1807 م ، ثُمَّ حَنَّ إِلَى حَيَاةِ الجُنْدِيَّةِ وَالْجِهَادِ ثَانِيَةً فَذَهَبَ إِلَى مُعَسْكَرِ أمِيْر خَانْ ، فِي تُوْنكْ ، بِإقْلِيْمِ رَاجِسْتَانَ ، وَأخَذَ يَحُثُّه عَلَى الْجِهَادِ وَالقِتَالِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَيُشَجِّعُه فِيْ حَرْبِهِ لِلْإنْجلِيْزِ ، ثُمَّ

[82] শেখ জেবুল আমিন দুলাল, *চেতনার বালাকোট*, ঢাকা: প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃ. ৪৬

[83] وهي الأسرة التي ينتسب إليها الأستاذ أبو الحسن الندوي العالم الهندي المعروف والذي يُشرف على دار العلوم في لكنو ، وقد أصدر جزئين في تاريخ السيد الشهيد بالأوردية .

رَجَعَ إِلَى دِهْلِي بَعْدَ أنْ اصْطَلَحَ أمِيْرُ تُوْنَك مَعَهُمْ ، وَأخَذَ يَدْعُو الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى التَّمَسُّكِ بِدِيْنِهِمْ ، وَتَرْكِ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ الشَّائِعَةِ فِيْ أوْسَاطِهِمْ ، مُتَعَاوِنًا فِيْ ذلِكَ مَعَ الْعَالِمَيْنِ الْجَلِيْلَيْنِ ، الشَّيْخ عَبْدِ الْحَيِّ وَالشَّاه إسْمَاعِيْلَ مِنْ أسْرَةِ شَاه وَلِيِّ اللهِ ، وَقَدْ بَايَعَاهُ عَلَى الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى بَتْنَا ، وَاتَّسَعَ نُفُوْذُه ، وَكَثُرَ أتْبَاعُه وَمُرِيْدُوْهُ ، وَمِنْ هُنَاكَ رَحَلَ إِلَى الْحِجَازِ لِلْحَجِّ سَنَةَ 1237 هـ - 1822 وَكَانَ ذلِكَ بَعْد أنْ هَزَمَ مُحَمَّدٌ عَلَي الْوَهَّابِيِّيْنَ وَأجْلَاهُمْ عَنِ الْحِجَازِ ، وَرَجَعَ بَعْدَ سَنَةٍ لِيَسْتَأنِف حَيَاةَ الْكِفَاحِ وَالْجِهَادِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ ، حَتَّى صَارَ لَه أتْبَاعٌ وَمُرِيْدُوْنَ فِيْ كُلِّ نَوَاحِي الْهِنْدِ ، يُبَايِعُوْنَه عَلَى التَّطْهِيْرِ والْجِهَادِ ، وَأخَذَ يَعُدُّ الْعُدَّةَ لِإنْقَاذِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ بَرَاثِنِ "السِّيْكِ" فِيْ بَنْجَاب ، وَبَدَأ فَرَاسَلَ الْأفْغَانَ بِمَقْصَدِه ، وَطَلَبَ مِنْهُمُ الْعَوْنَ وَالْمُسَاعَدَةَ ، فَاسْتَجَابُوْا لَه ، وَانْتَشَرَتْ دَعْوَتُه لِلْجِهَادِ فِيْ إيْرَانَ وَأفْغَانِسْتَانَ ، وَتَحَمَّسَ الجَمِيْعُ شُعُوْبًا وَحُكُوْمَاتٍ لِإنْقَاذِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ السِّيْكِ وَالْإنْجِلِيْزِ مَعًا ، وَلَمَّا وُثِّقَ مِنْ مُسَاعَدَةِ الْأفْغَانِ لَه كَوَّنَ جَيْشًا مِنْ أتْبَاعِه الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ الهِنْدِ ، وَسَارَ بِه نَحْوَ الْحُدُوْدِ الشَّمَالِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ ، وَعَسْكَرَ هُنَاكَ سَنَةَ 1240 هـ . 1824 م ، ثُمَّ أرْسَلَ إِلَى حَاكِمِ السِّيْكِ رَانْجِيْتْ سِنْك ، يَدْعُوْهُ إِلَى الإسْلَامِ أوِ الْجِزْيَةِ ، فَاسْتَشَاطَ الحَاكِمُ غَضَبًا ، وَزَحَفَ بِجَيْشِه لِقِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ عِدَّةَ مَعَارِكَ كَانَ النَّصْرُ فِيْ أكْثَرِهَا لِلْمُجَاهِدِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَقَدْ كَانَ السَّيِّدُ الْمُجَاهِدُ يَحْرِصُ فِيْ دَعْوَتِه عَلَى شَيْئَيْنِ : أوَّلُهَا تَطْهِيْرُ الدِّيْنِ مِنَ البِدَعِ وَالخُرَافَاتِ الفَاشِيَةِ فِيْ الْعَوَام ، وَثَانِيُهَا الدَّعْوَةُ إِلَى الْجِهَادِ . فَظَنَّ بَعْضُ العَوَامِّ وَالْعُلَمَاءِ أنَّ هُنَاكَ صِلَةً بَيْنَ دَعْوَةِ الْمُجَاهِدِ وَالدَّعْوَةِ الوَهَّابِيَّةِ الَّتِيْ شُوِّهَتْ سُمْعَتُهَا فِيْ الهِنْدِ ، نَظَرًا لِقِيَامِهَا بِهَدْمِ الْقُبَابِ فِيْ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَغَيْرِهَا ، مِمَّا جَعَلَ الرَّأيَ الْعَامَ الإسْلَامِيَّ يَكْرَهُهَا ، وَيَكْرَهُ كُلَّ مَنْ يَتَّصِلُ بِهَا ، وَمِنَ الأسَفِ أنَّ العَوَامَّ فِيْ الْهِنْدِ وَبَعْضَ الْعُلَمَاءِ انْسَاقُوْا وَرَاءَ عَوَاطِفِهِمْ ، وَتَأثَّرُوْا بِدَسَائِسَ الْإنْجلِيْزِ وَالسِّيْكِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ دَعْوَةَ الْمُجَاهِدِ لِتَطْهِيْرِ الدِّيْنِ مِنَ البِدَعِ وَالدَّعْوَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الَّتِيْ يَكْرَهُوْنَهَا، بَلْ

رَبَطُوْا هذِه بِتِلْكَ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاعُوْا الظُّرُوْفَ الخَطِيْرَةَ الَّتِيْ يَمُرُّ بِهَا المُسْلِمُوْنَ، وَالَّتِيْ تَسْتَدْعِي التَّكَاتُفَ العَامِ، وَعَدَمَ الْالْتِفَاتِ إِلَى مِثْلِ هذِهِ التَّفَاهَاتِ الشَّكْلِيَّةِ ، وَالْعَوَاطِفِ الذَّاتِيَّةِ ، وَالدِّعَايَاتِ الَّتِيْ يُرَوِّجُهَا الْإِنْجِلِيْزُ كَذلِكَ، فَطَعَنُوْا المُجَاهِدِيْنَ مِنَ الْخَلْفِ ، وَأَشَاعُوْا بَيْنَ العَوَامِّ أَنَّ هؤُلَاءِ المُجَاهِدِيْنَ وَرَئِيْسَهُمْ مِنَ الوَهَّابِيِّيْنَ ، فَنَفَّرُوْا مِنْهُمْ بَعْضَ النَّاسِ، وَأَتَاحُوْا لِلْأَعْدَاءِ أَنْ يَّسْتَفِيْدُوْا مِنْ هذِه الخِلَافَاتِ، بَلْ إِنَّهُمْ بِالْفِعْلِ أَعَانُوْا الْأَعْدَاءَ عَلَى إِخْوَانِهِمْ المُجَاهِدِيْنَ . وَيَا بِئْسَ مَا صَنَعُوْا . فَدَسَّ بَعْضُهُمُ السُّمَّ لِلسَّيِّدِ المُجَاهِدِ فِيْ عَشَائِه ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُنْجِيَه مِنْهُ ، بَعْدَ مَا ظَلَّ مُغْمِيًا عَلَيْهِ بِضْعَةَ أَيَّامٍ لِيُوَاصِلَ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْلِمِيْنَ ، وَقَدْ بُوْيِعَ السَّيِّدُ المُجَاهِدُ بِالْإِمَارَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَنُوْدِيَ بِاسْمِه فِيْ الخُطَبِ، ثُمَّ زَحَفَ عَلَى مَدِيْنَةِ بِشَاوَر ، وَهَزَمَ حَاكِمَهَا مِنْ قِبَلِ السِّيْكِ سُلْطَان مُحَمَّد خَان، وَاتَّخَذَهَا عَاصِمَةً لَه ، وَأَقَامَ الحُدُوْدَ وَعَيَّنَ القُضَاةَ، وَنَفَّذَ شَرْعَ اللهِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الظُّرُوْفَ اضْطَرَّتْهُ لِذلِكَ، لِأَنَّه لَمْ يَكُنْ يَطْمَعُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ فِيْ إِمَارَةٍ أَوْ رِيَاسَةٍ، بَلْ كَانَ كُلُّ هَمِّه أَنْ يَّسْتَخْلِصَ الهِنْدَ مِنْ يَدِ الْإِنْجِلِيْزِ وَالسِّيْكِ المُفْسِدِيْنَ ، وَيَتْرُكَهَا لِحُكَّامِهَا الْأَصْلِيِّيْنَ . [84]

সাইয়্যেদ আহমেদ বেরলভি সৈয়দ আহমেদ আশ-শহীদ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি লখনৌ প্রদেশের রায় বেরেলি গ্রামে 1201 হি/ 1786 খ্রিস্টাব্দের পহেলা মহরম একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইলম ও তাকওয়ার জন্য তাঁর পরিবার বিখ্যাত ছিল। তাঁর বংশধারা সাইয়েদুনা হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে মিলেছে। তিনি নিজে তার পিতা এবং তার শিক্ষকদের তাকে শেখানোর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার দিকে ঝোঁকেননি। অবশেষে তার সতেরো বছর বয়সে তার পিতা

[84]الدكتور عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ص 530 – 532 ، المؤسسات الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1981 م

ইন্তেকাল করলে তিনি নিজ শহর ছেড়ে লখনৌ তে চলে যান এবং একজন মুসলিম আমিরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি সেখানে বেশিদিন অবস্থান করেননি। তারপর তিনি 1221 হিজরি / 1806 খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে যান। সেখানে তিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। এরপর তিনি শাহ আবদুল কাদিরের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং তার ভাই শাহ আব্দুল আজিজ এর কাছ থেকে তাসাউফ অর্জন করেন। অবশেষে তিনি এমন জ্ঞান ও মারেফত অর্জন করেন যাতে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এ সময় তার বয়স ছিল 21 বছর। এরপর 1222 হিজরি/ 1807 খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সৈনিক জীবন এবং জিহাদের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি রাজস্থান প্রদেশের টঙ্কের আমির খানের কাছে গিয়ে তাকে জিহাদ করতে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করতে উৎসাহিত করেছিলেন, সাহস যুগিয়ে ছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তারপর টঙ্কের আমির তাদের সাথে সন্ধি করার পর পর তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন। মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম আঁকড়ে ধরার জন্য আহ্বান করতে শুরু করেন। একই সাথে যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিদআত তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলো পরিত্যাগ করতে বলেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহর পরিবার থেকে দুজন বিশিষ্ট আলেম শায়খ আব্দুল হাই এবং শাহ ইসমাঈল এক্ষেত্রে তার সহযোগী হয়েছিলেন। তারা দাওয়াত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে তার হাতে বায়াত হয়েছিলেন। তারপর তিনি পাটনায় চলে যান। সেখানে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়, তার অনুসারী ও মুরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেখান থেকে তিনি 1237 হিজরি / 1822 খ্রিস্টাব্দতে হজ্জের জন্য হিজাজে গিয়েছিলেন। এটা ছিল ওহাবীদেরকে মোহাম্মদ আলীর পরাজিত করা এবং হিজাজ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার পরের ঘটনা। তিনি এক বছর পর আবারও নতুন করে জিহাদ সংগ্রাম এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের জীবন শুরু করার জন্য ফিরে আসেন। এমনকি ভারতের সমস্ত অঞ্চলে

তার অনুসারী ও অনুগামী তৈরি হয়। তারা পরিশুদ্ধি ও জিহাদের জন্য তার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল। তিনি মুসলমানদের পাঞ্জাবের শিখদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি আফগানদের সাথে চিঠিপত্র আদান প্রদান শুরু করেন এবং তাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। তারাও সাড়া দিয়েছিল। এভাবে তার জিহাদের দাওয়াত ইরান ও আফগানিস্তানের ছড়িয়ে পড়েছিল। (মুসলিম) জনগণ এবং প্রশাসকগণ সবাই মুসলমানদের শিখ ও ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচাতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। তার মুজাহিদ বাহিনীর সাথে আফগানদের সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি যখন নিশ্চিত হলেন, তাঁর অনুসারী ভারতীয় মুজাহিদদের নিয়ে একটি সেনাবহিনী গঠন করে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে চলে গেলেন এবং ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ/ ১২৪০ হিজরীতে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এরপর তিনি শিখ শাসক রণজিৎ সিংকে চিঠি লিখলেন, সে যেন মুসলমান হয় নয়তো জিজিয়া দেয়। শিখ শাসক রাগে ফেটে পড়ল এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানদের সাথে তাদের অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছিল। বেশিরভাগ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের জয় হয়েছিল।

মুজাহিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল দুটি: ১. জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বিদআত এবং কুসংস্কার থেকে দীনকে পবিত্র করা এবং ২. জিহাদের আহ্বান। কিছু সাধারণ মানুষ ও আলেম মনে করতেন যে মুজাহিদের দাওয়াত এবং ওহাবী দাওয়াতের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। মক্কা ও মদিনার গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলতে তাদের তৎপরতা দেখা যাওয়ায় ভারতে তারা কলঙ্কিত হয়েছিল। ফলে সাধারণ মুসলিমরা ওয়াহহাবি দাওয়াতকে যেমন অপছন্দ করত, তেমনি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অপছন্দ করত। দুঃখের বিষয় হল ভারতের সাধারণ মানুষ ও কিছু আলেম তাদের আবেগের

কারণে বিপথগামী ছিল এবং ইংরেজ ও শিখদের প্রতারণায় প্রভাবিত হয়েছিল। তারা তাদের অপছন্দের ওয়াহাবি দাওয়াত এবং দীনকে বিদআত থেকে পবিত্র করার জন্য মুজাহিদদের দাওয়াতের মধ্যে কখনোই পার্থক্য করেনি। বরং এটার সাথে ঐটাকে মিলিয়ে ফেলেছে।

উপরন্তু মুসলমানদের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা যেমন তারা লক্ষ্য করেনি, তেমনি এর ফলে গণসংহতির প্রয়োজনীয়তা এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ মতামত, ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি এবং ইংরেজদের বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ইত্যাদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না, তাও খেয়াল করেনি। এজন্য তারা পেছন থেকে মুসলমানদের আঘাত করেছে আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যে মুজাহিদ এবং তাদের নেতারা সবাই ওয়াহাবি।

ফলে তখন কিছু মানুষ তাদের অপছন্দ করেছে আর শত্রুদেরকে এই মতভেদে উপকৃত হবার সুযোগ করে দিয়েছে।এমনকি তারা তাদের মুজাহিদীন ভাইদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করেছিল। তারা কী খারাপ কাজটাই না করেছে। তাদের মধ্যে একজন মুজাহিদদের নেতাকে রাতের খাবারে বিষপ্রয়োগ করেছিল। ফলে তিনি কিছু দিন অজ্ঞান ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসলমানদের কল্যাণে জিহাদ জারি রাখতে আল্লাহই তাকে বাঁচাতে চেয়েছেন। মুজাহিদ সায়্যিদ র. এর কাছে মুসলমানদের শাসক হবার জন্য বায়াত করা হয়েছিল, খুতবায় তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছিল। এরপর তিনি পেশোয়ার শহরের দিকে লড়াইয়ে অগ্রসর হন এবং শিখদের পক্ষের শাসক সুলতান মুহাম্মদ খানকে পরাজিত করেন এবং এটিকে তাঁর রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দেন, বিচারক নিযুক্ত করেন এবং আল্লাহর শরিয়াত প্রতিষ্ঠা করেন। দেখা যাচ্ছে যে পরিস্থিতি তাকে এসব করতে বাধ্য করেছিল। কারণ তিনি একদিনের জন্যও শাসন বা নেতৃত্বের জন্য লোভ করেননি,

বরং তার পূর্ণ মনোযোগ ছিল ইংরেজ এবং ফাসাদকারী শিখদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করা এবং ভারতকে প্রকৃত শাসকদের হাতে ন্যস্ত করা।[85]

।।। ২৬ ।।।

মুহাম্মাদ আল-ফাদ্বিল ইবনে আলী আল-লাফী বলেন,

وَلكِنْ هؤُلَاء كَانُوْا فِيْ إِخْلَاصِهِمْ لِفِكْرَتِهِمْ ، لَا يُبَالُوْنَ بِمَا يُلَاقُوْنَ مِنْ عَذَابٍ وَّ تَنْكِيْلٍ ، وُيُسَمِّيْهِمُ الْمُؤَرِّخُوْنَ الَّذِيْنَ كَتَبُوْا عَنِ الْهِنْدِ مِنَ الإِنْجْلِيْزِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ بِالوَهَّابِيِّيْنَ ، ظَنًّا مِّنْ أَنَّ بَاعِثَ فِكْرَتِهِمْ السَّيِّدُ أَحْمَدُ عِرْفَانَ الشَّهِيْدُ ، كَانَ وَهَّابِيًّا ، لِتَشَابُهِه مَعَ الْوَهَّابِيَّةِ فِيْ الدَّعْوَةِ لِتَطْهِيْرِ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ مِنَ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ ، وَقَدِ ازْدَادَتْ هذِه التَّسْمِيَةُ لُصُوْقاً بِهِمْ ، لِأَنَّه كَانَ لِلْإِنْجْلِيْزِ غَرَضٌ خَاصٌّ مِنْ وَرَائِهَا ، إِذِ اسْتَعْمَلُوْهَا تُهْمَةً يُشَوِّهُوْنَ بِهَا هَؤُلَاءِ الْمَجَاهِدِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ ، وَيَضَعُوْنَهُمْ أَمَامَ أَغْلَبِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، الَّذِيْنَ حَقَدُوْا عَلَى الْحَرَكَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الْأُوْلَى مِنْ أَجْلِ هَدْمِهَا لِلْقُبَابِ فِي الْحِجَازِ . وَقَدْ سَعَى الإِنْجْلِيْزُ لِتَأْكِيْدِ هذِه التُّهْمَةِ خَاصَّةً بَعْدَ هِجْرَةِ رَحْمَتِ اللهِ وَكَثِيْرٍ مِنَ المُجَاهِدِيْنَ إِلَى الْحِجَازِ ، وَظَلَّتْ سَيْفاً حَادًّا يُشْهِرُوْنَه فِيْ كُلِّ مُنَاسَبَةٍ لِتَنْفِيْرِ المُسْلِمِيْنَ العُلَمَاءَ القَائِمِيْنَ بِالدَّعْوَةِ الدِّيْنِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ ، لِإِخْرَاجِ الْإِنْجْلِيْزِ مِنَ الْبِلَادِ[86]

কিন্তু এই লোকেরা[87] তাদের ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তারা যে যন্ত্রণা এবং অপব্যবহার ভোগ করবে সে সম্পর্কে তারা পরোয়া করেনি এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যারা ভারত সম্পর্কে লিখেছেন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে তারা তাদের ওয়াহাবী বলে

[85] ড. আব্দুল মুনইম আন-নিমার, তারীখুল ইসলাম ফিল হিন্দ, পৃ ৫৩০ – ৫৩২, আল-মু আসসাসাতুল জামিয়িয়্যাহ লিদ্দিরাসাতি ওয়ান নাশরি ওয়াত্তাউজী', বৈরুত, লেবানন, ১৯৮১।

[86] محمد الفاضل بن علي اللافي ، دراسات عقائد النصرانية : منهجية ابن تيمية ورحمت الله الهندي ، ص 137 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الطبعة الأولى 2007م

[87] বৃটিশবিরোধী মুজাহিদ বাহিনী।

অভিহিত করে এই ভেবে যে তাদের ধারণার প্রেরণা, জনাব আহমেদ ইরফান শহীদ, একজন ওহাবী ছিলেন, কারণ ইসলামি সম্প্রদায়কে ধর্মদ্রোহিতা ও কুসংস্কার থেকে শুদ্ধ করার আহ্বানে ওয়াহাবিবাদের সাথে তার মিল ছিল এবং এই লেবেলটি তাদের সাথে আরও বেশি করে সংযুক্ত হয়েছে, কারণ ইংরেজদের এর পিছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, কারণ তারা এটিকে একটি অভিযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছিল যার সাথে তারা এই আন্তরিক মুজাহিদিনদের বিকৃত করেছিল এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সামনে রেখেছিল, যারা হিজাজে গম্বুজ ভেঙে ফেলার জন্য প্রথম ওয়াহাবি আন্দোলনকে ঘৃণা করেছিল। ব্রিটিশরা এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, বিশেষ করে রহমতুল্লাহ এবং অনেক মুজাহিদীন হিজাজের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগের পর। এবং এটি একটি ধারালো তলোয়ার ছিল যা তারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আহ্বানের পক্ষে থাকা মুসলিম পণ্ডিতদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই চালাত, যাদের মিশন ছিল ব্রিটিশদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা।[88]

[88] মুহাম্মাদ আল-ফাদ্বিল ইবনে আলী আল্লাফী, দারাসাতু আকাইদিন নাসরানিয়্যাহঃ মানহাজিয়্যাতু ইবনে তাইমিয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহ হিন্দী, পৃ ১৩৭, আল-মা'হাদুল ইসলামী লিলফিকরিল ইসলামী, আমেরিকা, ২০০৭ইং।

তাসাউরে শায়খ:

তাসাউরে শায়খ বিষয়ক আলোচনায় মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার বইয়ের ৩ ও ৪ পৃষ্টায় মারাত্মক খেয়ানত করেছেন। তিনি লেখেন,

"বংশগত সৈয়দ ঘরানার হলেও আমর বিন সা'দ ও ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার মত তবীয়তে যে ঔদ্ধ্যত্য ও অহমিকা ছিল, তা প্রকাশ পেল- যখন হযরত পীর ও মুর্শেদ ত্বরীকতের একটি বিশেষ দীক্ষা মুরাকাবায় মুর্শেদের ধ্যান অর্থাৎ তাছাব্বুরে শায়খ (تصور شيخ) এর সবক দিলেন। সৈয়দ সাহেব বলে দিলেন, এটা আমার দ্বারা হবে না। কারণ এ'তো সুস্পষ্ট শির্ক। এ একটি মাত্র উক্তি দ্বারা প্রিয়তম নবীয়্যে মুকাররম ﷺ থেকে আরম্ভ করে আদ্যোপান্ত সিলসিলার সব মাশায়েখে কেরামের উপর শির্কের ফতোয়া লাগিয়ে দিলেন।

ইখতিলাফে দ্বীনের (ধর্মের ভিন্নতার) কারণে যখন জন্মদাতা পিতার সাথে পুত্রের মীরাস অর্থাৎ উত্তরাধীকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন মুশরীক পীর (?) শাহ্ আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ভারতবর্ষে তাওহীদী সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর সাথে ত্বরীকত ও পীর-মুরীদির সম্পর্ক কখনও অক্ষুন্ন থাকতে পারে না। তাই সৈয়দ আহমদ বেরেলবীকে মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আব্দুল আজীজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা সাব্যস্ত করা দিন-দুপুরে পুকুরচুরি নয় কী?"[89]

মৌলবি আশরাফুজ্জামান আল বেরেলভী আল ওয়াহাবী এখানে কেবল মিথ্যাচারই করেননি, নিজে নিজের পায়ে কুড়ালও মেরেছেন। তাসাউরে শায়খ বিষয়ক আলোচনার মূল অংশ তিনি গোপন করেছেন। পাশাপাশি তিনি শাহ আব্দুল আজীজ

[89] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩ – ৪

রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "মুজাহিদে মিল্লাত শাহ আব্দুল আজীজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি"। অথচ তিনিই তার এই বইতে প্রমাণ করেছেন শাহ আব্দুল আজীজ ওহাবী ছিলেন!!! আর তাদের হজরতের বইতে আছে ওহাবীরা মুরতাদ। একজন মুরতাদকে "মুজাহিদে মিল্লাত" "রাহমাতুল্লাহি আলাইহি" বলা কি কুফুরী নয়? দেখুন তার দলীল ১ ও ৬।

।। ১ ।।

"দিক দর্শন' প্রকাশনী লি: ২৬ বাংলা বাজার, আলী রেজা মার্কেট (৩য় তলা) ঢাকা-১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি.এস.এস. (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষের (২০১৩-১৪) সর্বজনাব মাহমুদুল মুর্শিদ (সুমন), মো: মাসুদ রানা, শাহনাজ পারভীন ও বসুদেব বিশ্বাস কর্তৃক রচিত এবং আর.সি.পাল সম্পাদিত (পরীক্ষা সহায়ক গ্রন্থ) 'রাষ্ট্র বিজ্ঞান' "ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন (১৭৫৭-১৯৪৭), পুস্তকের ১২১ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন- প্রশ্ন-১০- ওয়াহাবী আন্দোলন কী?

উত্তরের প্রথম প্যারা ৪র্থ লাইন থেকে পড়ুন-'অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লির শাহ ওয়ালিউল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত এ শান্তিপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন পরবর্তীকালে তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আজীজের শিষ্য সৈয়দ আহমদ (বেরলভি) এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পুত্র আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ বেরলভি প্রমুখের আদর্শ ও কর্মপন্থার সাথে আরবের ওয়াহাবের মিল ছিল বলে এ আন্দোলনের নাম "ওয়াহাবি আন্দোলন"। এর পরবর্তী প্যারায় লিখতেছেন- "উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।...ভারতে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১)। ১৮২০ সাল হতে

সৈয়দ আহমদ আরবের ওয়াহাবিদের অনুকরণে ধর্মীয় সংস্কারের বাণী প্রচার শুরু করেন।... বহু মুসলিম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সৈয়দ আহমদ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে চারজন খলিফা নিযুক্ত করেন। তার এ ধর্মীয় ও সংস্কার আন্দোলনই "ওয়াহাবী আন্দোলন" নামে পরিচিতি লাভ করে।"[90]

।। ৬ ।।

"বিদ্যাসাগর কলেজ কলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় লিখিত, 'শ্রীধর পাবলিশার্স" ২০৯ বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৬ কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিম বঙ্গ সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন পরীক্ষার সহায়ক গ্রন্থ "স্বদেশ, সভ্যতা ও বিশ্ব' পৃঃনং-৩৮০, "ওয়াহাবি আন্দোলন: শিরোনামে-

"ওয়াহাবি আন্দোলন এর প্রকৃত নাম 'তারিখ-ই মহম্মদিয়া (তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া)। অষ্টাদশ শতকে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহব (১৭০৩-১৭৮৯) নামে জনৈক ব্যক্তি আরব দেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় "ওয়াহাবী" এবং তার প্রচারিত ধর্মমত "ওয়াহাবি বাদ' নামে পরিচিত। ভারতে এই আন্দোলনের সুচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । দিল্লীর বিখ্যাত মুসলিম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) ও তার পুত্র আজিজ (১৭৪৬- ১৮২৩) এই সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।'

"শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ এই আন্দোলনের সূচনা করলেও ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলির অধিবাসী "সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি (১৭৮৬-১৮৩১)।...তিনি মক্কায় তীর্থে যান এবং সেখানে ওয়াহাবি মতাদর্শের সঙ্গে সুপরিচিত হন। ১৮২২ সালে ভারতে ফিরে

[৯০] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯-১০

এসে তিনি ওয়াহাবি আদর্শে ভারতে 'শুদ্ধি' আন্দোলন শুরু করেন।

পৃ. নং-৩৮১ বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মির নিশার আলি বা তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১)। উনচল্লিশ বছর বয়সে মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহমদের সঙ্গে পরিচিত হন ও ওয়াহাবি আদর্শ গ্রহণ করেন।"[91]

তার দলীল ৩, ৭ ও ৮ এ শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহকে ওয়াহাবী সাব্যস্ত করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ হলেন শাহ আব্দুল আজীজের পিতা ও মুর্শিদ!! মৌলবি আশরাফুজ্জামান নিজ হাতে নিজ গালে এত নিষ্ঠুর চপেটাঘাত করতে পারবেন, কল্পনা করা যায়!!! দেখুন-

।। ৩ ।।

"মুহাম্মদ জাকির হোসেন সিঃ প্রভাঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিঃ কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদরাসা কুষ্টিযয়া কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত ও প্রকৌ: মেহেদী হাসান লেকচার পাবলিকেশন্স লি: ৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে আলিম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রণীত-

"আলিম পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয়পত্র)" গ্রন্থে ৮৬ নং পৃ. হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০) শিরোনামে লিখা হচ্ছে- ""শরীয়তুল্লাহ্ অল্প বয়সে মক্কায় গমন করেন। সেখানে প্রায় ২০ বছর অবস্থান করে ১৮১৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। মক্কায় তিনি "ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা' শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর চিন্তাধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।"[92]

[৯১] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১-১২

[৯২] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১০

।। ৭ ।।

সমর কুমার মল্লিক ও প্রশান্ত দত্ত রচিত এবং ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, রাজেন্দ্র দেব রোড কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই- "ইতিহাস ও পরিবেশ চর্চা" পৃষ্ঠা নং ৪৭, শিরোনাম "তরীকা-ই মহম্মদিয়া' ''ওয়াহাবি আন্দোলনের আসল নাম হল "তরিকা-ই মহম্মদিয়া (মহম্মদ নির্দেশিত পথ)। ওয়াহাবি শব্দটি আরবীয় সংস্কারক মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব' এর নাম থেকে এসেছে। অষ্টাদশ শতকে মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি আরবে ইসলাম ধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রথম এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাকে অনুসরণ করে ভারতীয় ওয়াহাবি সম্প্রদায়। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে দিল্লীর মুসলিম সন্ত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটান। উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ বেরলবী ছিলেন ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।
বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত, যার নেতৃত্ব দেন মির নিসার আলি বা তিতুমির।"[93]

।। ৮ ।।

'"বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামিক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন রূপে ওয়াহাবি আন্দোলনের সুচনা হয়। ভারতে হাজি ওয়ালিউল্লাহ এর নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হলেও প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন "সৈয়দ আহমদ' বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা তিতুমীর বা মীর নিশার আলী।"

রইল তাসাউরে শায়খের বিষয়। আসুন দেখি একটি কিতাব,

---

৯৩ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী বেরলবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ: গোলাম মেহের

بیعتِ تزکیۂ نفس

۱۲۲۲ھ میں سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز سے بیعت کی، اس وقت ہندوستان میں تصوف کے تین سلسلے زیادہ رائج تھے، یعنی نقشبندیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ طالب جس سلسلے میں بیعت کرنا چاہتا تھا، شاہ صاحب اسی سلسلے کا طریقۂ ذکر و شغل سکھاتے تھے۔ سید صاحب نے تینوں سلسلوں میں بیعت کی۔(۱) پہلے دن لطیفۂ اول یعنی ذکر قلب کی تعلیم ہوئی، دوسرے دن باقی لطائف یعنی لطیفۂ روح، لطیفۂ سر، لطیفۂ خفی، لطیفۂ اخفیٰ اور لطیفۂ نفس کا ذکر سکھایا گیا، تیسرے جلسے میں سلطان الاذکار اور چوتھے جلسے میں ذکر نفی و اثبات بتایا گیا۔ پھر شغلِ برزخ کا حکم ہوا جس میں صورتِ شیخ کا تصور صوفیہ میں مروج تھا۔(۲)

تصورِ صورتِ شیخ کا حکم سنا تو سید صاحب نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت! اس شغل اور بت پرستی میں کیا فرق ہوا؟ مفصل ارشاد ہو۔ شاہ عبدالعزیز نے جواب میں خواجہ حافظ کا یہ مشہور شعر پڑھا:

بہ مے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغاں گوید　　کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

سید صاحب نے دوبارہ عرض کیا کہ میں بہرحال فرماں بردار ہوں اس لئے کہ کسب

---

(۱) "مخزن احمدی" میں ہے: در سنہ بست و دوم بعد مرور یک ہزار و دو بست و بست و دو سال ایں سعادت عظمیٰ و عطیہ کبریٰ بہ حضرت ایشاں دست داد (ص: ۱۸)

(۲) لطائف ستہ کی سرسری کیفیت میں نے پیش کر دی ہے، سلطان الاذکار کا مطلب یہ ہے کہ سراپا ذکر بن جائے۔ نفی و اثبات شرح کا محتاج نہیں۔ ان تمام امور یا شغل برزخ کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ خود اس کوچہ سے نابلد ہوں۔ البتہ یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ متن کے تمام مطالب "مخزن احمدی" (ص: ۱۸، ۱۹) اور "وقائع احمدی" (ص: ۲) سے ماخوذ ہیں۔

فیض کی غرض سے آیا ہوں، لیکن تصورِ شیخ تو صریح بت پرستی معلوم ہوتا ہے۔ اس خدشے کو زائل کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے کوئی دلیل پیش فرما دیں، ورنہ اس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں۔ شاہ صاحب نے یہ سنتے ہی سید صاحب کو سینے سے لگالیا، رخساروں اور پیشانی پر بوسے دیے اور فرمایا: "اے فرزندِ ارجمند! خدائے برتر نے اپنے فضل ورحمت سے تجھے ولایتِ انبیاء عطا فرمائی ہے۔"(۱)

ولایتِ انبیاء اور ولایتِ اولیاء

سید صاحب نے ولایتِ انبیاء اور ولایتِ اولیاء کی تشریح پوچھی تو شاہ صاحب نے فرمایا: جس شخص کو ولایتِ اولیاء عطا ہوتی ہے وہ رات دن ریاضت ومجاہدات، صوم وصلوٰۃ اور کثرتِ نوافل میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کی صحبت پسند نہیں کرتا۔ چاہتا ہے کہ گوشۂ تنہائی میں خدا کی یاد سے لذت اندوز ہوتا رہے۔ اسے فاسقوں اور فاجروں کو وعظ ونصیحت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے "قرب بالنوافل" کہتے ہیں۔

ولایتِ انبیاء کا درجہ جس خوش نصیب کو مرحمت ہو، اس کے دل میں محبتِ الٰہی اس طرح سما جاتی ہے کہ اس کے سوا کسی چیز کے لئے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ بروقت

(۱) یہ روایت مخزنِ احمدی، وقائع احمدی اور دوسری کتابوں میں اسی طرح درج ہے۔ ممکن ہے اس سے کسی صاحب کو وسوسہ پیدا ہو کہ کیا شاہ عبد العزیز جیسا یگانہ عالمِ دین اس حقیقت سے ناواقف تھا کہ تصورِ صورتِ شیخ کے لئے قرآن وحدیث میں کوئی سند موجود نہیں، یا اس تصور کو عام صنم پرستی سے الگ نہیں کیا جاسکتا؟ میں اس بارے میں تحقیقی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیال یہ ہے کہ صوفیہ نے طالب کی توجہ جمانے کے لئے مختلف طریقے اختیار کیے، ان میں سے ایک طریقہ تصورِ صورتِ شیخ کا بھی تھا، جس سے یہ بزرگ کام لیتے رہے۔ سید صاحب کی طبیعت اتنی پاک واعلیٰ تھی کہ اسے قبول نہ کر سکی۔ شاہ صاحب چونکہ طبیبِ حاذق تھے اس لئے سمجھ گئے کہ یہ دوا سید کے مزاج کے لئے سازگار نہ ہوگی، لہٰذا اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ مقصود دوسرے طریقوں سے بوجہ احسن حاصل ہو سکتا تھا تو تصورِ شیخ پر اصرار کی ضرورت نہ تھی۔

بندگانِ خدا کو نیکی کی راہ پر لگانے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ مرضیاتِ باری تعالیٰ کے کسی کام میں دنیا داروں کے طعن وملامت کی پروا نہیں کرتا۔ وہ توحید کی اشاعت میں بے خوف اور سننِ رسولِ پاکؐ کے احیاء میں بے باک ہوتا ہے۔ ضرورت پیش آئے تو مخالفوں کے ساتھ مجاہدات میں مال وجان قربان کرتے وقت بھی متامل نہیں ہوتا۔ وہ للہ فی اللہ تمام محفلوں اور مجلسوں میں جاتا ہے، سب کو وعظ ونصیحت سناتا ہے۔ اس کارِ خیر میں جو تکلیفیں اور اذیتیں پیش آئیں اُن پر صبر کرتا ہے۔ اسے اصطلاح میں "قرب بالفرائض" کہتے ہیں۔(۱)

بہر حال سید صاحب نے سیر وسلوک کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کرلیں، شاہ عبد العزیز نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

> ایں سید عالی تبار در علم باطن چناں ذکی الطبع اند کہ بہ اندک اشارہ مقاماتِ عالیہ را فہم نمودہ طے مے کنند۔
>
> **ترجمہ** : یہ سید عالی تبار، علم باطن میں اتنے ذکی ہیں کہ معمولی سے اشارے کی بناء پر مقاماتِ عالیہ کو سمجھ جاتے ہیں اور انہیں طے کرلیتے ہیں۔

شبِ قدر اور سعادتِ حضوری

اس زمانے میں سید صاحب نے بڑی کٹھن ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے تھے۔ نواب وزیر الدولہ مرحوم نے لکھا ہے کہ آغازِ سلوک میں سالہا سال تک سید صاحب عشاء، فجر کی نمازیں ایک وضو سے ادا کرتے رہے، یعنی دونوں نمازوں کا درمیانی وقت کاملاً عبادت میں بسر فرماتے تھے۔(۲) بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیامِ لیل کے باعث آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔

(۱) یہ بیان "مخزنِ احمدی" اور "وقائع احمدی" کی تحریرات پر مبنی ہے۔ (۲) وصایا نصف اول ص ۲۵۶

“১২২২ হিজরিতে সাইয়িদ সাহেব শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ’র কাছে বায়আত হন। ঐ সময় হিন্দুস্তানে তাসাউফের ৩টি সিলসিলা বেশী প্রচলিত ছিল। নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া এবং চিশতিয়া। ছাত্র যে সিলসিলায় বায়য়াত হতে ইচ্ছা পোষণ করতেন, শাহ সাহেব ঐ সিলসিলার জিকির ও শুগল শিক্ষা দিতেন। সাইয়িদ সাহেব ৩ সিলসিলাতেই বায়আত হলেন। ১ম দিন ১ম লতিফা অর্থাৎ কলবের জিকর শিক্ষা হল, ২য় দিন বাকী সব লতীফা অর্থাৎ রুহ, সির, খফী, আখফা এবং নফসের জিকর শিক্ষা দিলেন। ৩য় বৈঠকে সুলতানুল আযকার এবং ৪র্থ বৈঠকে নফী ও ইসবাতের। অতপর শুগলে বারযাখের হুকুম হল। যাতে শায়খের সূরত তাসাউর করার কথা আছে, যা সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

তাসাউরে সুরাতে শায়খের হুকুম শুনে সাইয়িদ অত্যন্ত আদবের সাথে আরজ করলেন, এই শুগল এবং বুতপরস্তির মধ্যে কি পার্থক্য? শাহ সাহেব জবাবে খাজা হাফিজের বিখ্যাত কবিতার ছন্দ পড়লেন,

সাইয়িদ সাহেব ২য় বার আরজ করলেন, আমি সর্বাবস্থায় ফরমাবরদার (আপনার হুকুমের অনুগত), এবং ফয়েজ হাসিলের জন্যই এসেছি, কিন্তু তাসাউরে শায়খ বুতপরস্তি মনে হয়, এই খটকা দূর করার করার জন্য কুরআন ও হাদীস থেকে একটি দলীল পেশ করে দিন, নতুবা এই অক্ষমকে এই শুগল থেকে মাফ রাখুন, শাহ সাহেব এই কথা শুনার সাথে সাথে সাইয়িদ সাহেবকে বুকের সাথে লাগালেন এবং মুখে ও কপালে চুম্বন করে বললেন, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর ফজল ও রহমতে তিনি তোমাকে বেলায়তে আম্বিয়া দান করেছেন।

সাইয়িদ সাহেব বেলায়তে আম্বিয়া এবং বেলায়তে আউলিয়া’র ব্যাখ্যা জানতে চান। (শাহ সাহেব তার সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। দেখুন স্ক্রিনশট।)

DEVELOPMENT OF SUFISM IN BENGAL: Muhammad Ismail

‘The doctrine of Tasawwur-i-Shaikh is commonly practiced by the followers of all the important Sufi orders of India up to tho days of Shah Abdal Aziz. It is related that when Syed Ahmad Shohid became accept bnyat at the hands of Shah Abdul Aziz, the later taught him the principle s of Tasawwur -i-Shaikh or Rabita to Syed Saheb. Thr biographers record that Syed Saheb raised objection to it and said that it is not corroborated by the Sunnah of the Holy Prophet, Shah Abdul Aziz was astonished at this and went into meditation and after he got up and said that due to special spiritual relation and Nisbat with the Holy Prophet you need not have to follow the principle of Rabita. It is from this time onwards that the doctrine of Tasawwur is not practiced by the followers of Syed Ahmad Shahid, a large number of them have worked in the region of Bengal’.[94]

‘তাসাওউর-ই-শাইখের মতবাদ শাহ আবদুল আজিজের আগ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সূফী তরিকাগুলোর অনুসারীরা আমভাবে চর্চা করতেন। বর্ণিত আছে যে সৈয়দ আহমদ শহিদ যখন শাহ আব্দুল আজিজের হাতে বাইয়াত করেন, তাকে শাহ আব্দুল আজিজ তাসাওউর -ই -শাইখ বা রবিতার (পীরের সাথে সংযোগ) মূলনীতিগুলো শেখান। জীবনীবিদরা উল্লেখ করেন যে সৈয়দ সাহেব এতে আপত্তি তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি মহানবীর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। শাহ আবদুল আজিজ

[94] Muhammad Ismail, De*velopment of Sufism in Bengal*, PhD Thesis, Department of Islamic Studies Aligarh Muslim University Aligarh (India), 1989. P. 212

এতে বিস্মিত হয়ে মোরাকাবা করলেন এবং মোরাকাবা শেষে উঠার পর বললেন, মহানবীর সাথে বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও নিসবতের জন্য আপনাকে রাবিতার নীতি অনুসরণ করতে হবে না। এই সময় থেকেই সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীরা তাসাওউরের মতবাদ পালন করেন না। তাদের একটি বিরাট অংশ বাংলায় কাজ করেছেন।'

চেতনার বালাকোট: শেখ জেবুল আমিন দুলাল

'১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলবীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। শাহ্ সাহেব সৈয়দ আহমাদকে দোয়া করলেন, আল্লাহ তোমাকে বেলায়েতে আম্বিয়া এবং 'বেলায়েতে আওলিয়া" দান করুন।" সৈয়দ আহমাদ "বেলায়েতে 'আম্বিয়া" এবং: "বেলায়েতে আওলিয়া" সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শাহ সাহেব বললেন, বেলায়েতে আম্বিয়া মানে নবীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নির্ভীক, প্রয়োজনবোধে শত্রুর মোকাবিলায় জান-মাল কোরবান করার জন্য প্রস্তুত থাকা, দাওয়াতে দ্বীনের জন্য যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করা এবং সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা। এটাকে বলা হয়, 'কুর্ব বিল ফারায়েজ' অর্থাৎ ফরজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। 'বেলায়েতে আওলিয়া" মানে রাত দিন নামাজ, রোজা, জিকির, নফল এবাদত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকা । লোকালয় ত্যাগ করে নির্জনে আল্লাহর স্মরণে সময় অতিবাহিত করা। শুধুমাত্র নিজেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর জন্য নফল এবাদতে মশগুল থাকা। এটাকে বলা হয় 'কুর্ব বিন নাওয়াফেল'। অর্থাৎ 'নফল এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ'।[95]

---

[95] শেখ জেবুল আমিন দুলাল, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের ঐতিহাসিক প্রতারণা

মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার ১৪ নাম্বার দলীলে মারাত্মক প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। দেখুন তার বক্তব্য:
"পাণিনী প্রিন্টার্স ১৪/১ তনুগঞ্জলেন, সুত্রাপুর ঢাকায় মুদ্রিত, মনিরুল হক কর্তৃক "অনন্যা' ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত "এস.আর, আখতার মুকুল রচিত "কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী" পৃ. নং ৮৬/৮৭। শিরোনাম- 'ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলনের গোড়াপত্তন। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায়, ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[96] তিনি ১৮২২ সালে হজ্ব যাত্রা করেন।[97] এ সময় তিনি মরহুম আল্লামা আবদুল ওয়াহাব এর বেশ কজন অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তার চিন্তাধারা পরিধির ব্যাপ্তি ঘটে। অতঃপর সৈয়দ আহমদ ১৮২৩ সালের অক্টোবরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলামী দর্শনের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তাকে 'তরীকা-ই মুহাম্মদিয়া' বা মুহাম্মদের নীতি বলে অভিহিত করেন।[98]... তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। এজন্যে বিভিন্ন এলাকায় কট্টর রক্ষণশীল ওহাবী মতাদর্শ প্রচার ছাড়াও অসংখ্য বাঙালি মুসলমান যুবককে মুজাহিদ হিসেবে সংগ্রহ।

---

[96] আশরাফুজ্জামান এখানে তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন। একটু পরে মূল বই থেকে পূর্ণ বক্তব্য দেখুন।

[৯৭] আশরাফুজ্জামান এখানে আবার তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন।

[৯৮] এখানে আবার তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন। একটু পরে মূল বই থেকে পূর্ণ বক্তব্য দেখুন।

অনেক গবেষক দ্বিমত পোষণ করলেও এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ হান্টার রচিত রচিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে বর্ণিত মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

'পূর্ব বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবী প্রচারকেরা সাধারণতঃ বিশ বছরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে অনেক সময় তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র ও শোক প্রবিষ্ঠ করিয়েছে। আর আশা-ভরসাস্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবী পিতার বিশেষ গুণবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রাণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না, কোন সময়ে তার পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে।[৭৭] এইভাবে যেসব যুবককে উধাও করা হয়েছে, তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে। (অনুবাদ: আবদুল ওদুদ)

এবার দেখুন মূল বই থেকে পূর্ণ বক্তব্যঃ

ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলনের গোড়াপত্তন
ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী ১৭৮৩ খিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, "যেই পরিবারে তাহার জন্ম, তাহার সহিত পিন্ডারী সরদার আমীর খানের আত্নীয়তার বন্ধন ছিল বলে অনেকের ধারণা ।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম পৃ:৪৭) কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সৈয়দ ব্রেলভী প্রথম জীবনে সরদার আমীর খানের দলভুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি অসি বিদ্যা ও অশ্ব চালনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। উপরন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা-আক্রোশের সৃষ্টি হয়।
এদিকে সরদার আমীর খান ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বেরেলী থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করে তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শাহ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি রোহিলা খণ্ডসহ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং বহু ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা দান করেন। ১৮১৮ সালে তিনি পাটনায় একটি শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। জনসমাবেশ হয়। তিনি কোলকাতা থেকে বিপুলসংখ্যক অনুচর নিয়ে ১৮২২ সালে হজ যাত্রা করেন। এরকম তথ্য রয়েছে যে, সে সময় শুধু তার অনুচরদের জন্য সবশুদ্ধ ১১টি জাহাজ ভাড়া করতে হয়েছিল।
পবিত্র হজ যাত্রার প্রাক্কালে সৈয়দ সাহেব এ মর্মে সংবাদ লাভ করেন যে, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে সেখানকার শিখ শাসন কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধাদান ছাড়াও নানা ধরনের অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছে। তিনি বিধর্মী শিখদের এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে অর্থ এবং বিরাট সংগঠনের । ফলে তিনি পাটনা কেন্দ্রের দুইজন বিশ্বস্ত অনুসারী শাহ ইসমাইল ও আবদুল হাইকে তার প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার অব্যাহত রাখা ছাড়াও অত্যন্ত সঙ্গোপনে জেহাদের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। পরবর্তীকালে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অত্যন্ত গোপনে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি সংগঠন সৃষ্টি এবং বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মুজাহিদ রিক্রুট ও নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

[৭৭] তারমানে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং মুজাহিদগণ ওহাবী ছিলেন না।

গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মতে পবিত্র হজ্ব পালনের পর সৈয়দ সাহেব মধ্যপ্রাচ্যে বহু দেশ সফর করেন এবং একমাত্র কনস্তান্তিনোপলেই (ইস্তাম্বুলেই) শিষ্য ও দর্শনার্থীদের নিকট থেকে নয় লক্ষাধিক টাকা নজরানা পেয়েছিলেন। এ সময় তিনি মরহুম আল্লামা আবদুল ওহাব-এর বেশ ক'জন অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তার চিন্তাধারা পরিধির ব্যাপ্তি ঘটে। অতঃপর সৈয়দ আহমদ ১৮২৩ সালের অক্টোবরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইসলামী দর্শনের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তাকে "তরীক-ই-মোহাম্মদিয়া" বা "মোহাম্মদের নীতি" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবার তার মুখে উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে "মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম।" অর্থাৎ খ্রিস্টান ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষ হচ্ছে "দারুল হরব" বিধর্মীর এলাকা । তার এই মতবাদ-এর আরও ব্যাখ্যাদান করলে বলতে হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ খ্রিস্টানদের পদানত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই "দারুল হরব"-এ ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। ভারত পরিভ্রমণের পর দ্বিতীয় দফায় কোলকাতা পর্যন্ত আগমন করেন। প্রতিটি এলাকাতেই তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন অত্যন্ত সঙ্গোপনে, বিশেষ করে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ অথবা "দারুল হরব' এই হিন্দুস্থান থেকে হিজরতের আহবান জানালেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি সবার অলক্ষ্যে এই জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সদলবলে ইংরেজদের করদ রাজ্য টংক-এ উপস্থিত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তার সক্রিয় সমর্থনে দুর্গম এলাকার মাঝ দিয়ে সৈয়দ আহমদ তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আফগান এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মুসলমানদের

সমর্থনে এখান থেকেই শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ-এর শাসনাধীন পাঞ্জাব আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা ।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সীমান্ত প্রদেশের আফগান এলাকায় পৌঁছানোর পর তার প্রতিনিধিরা যেভাবে বাংলা ও বিহার এলাকা থেকে অর্থ ও নতুন রিক্রুট করা মুজাহিদদের ট্রেনিং প্রদানের পর নিয়মিতভাবে প্রেরণ করেছে, তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা । এজন্য পাটনা শহরেই প্রতিষ্ঠিত হলো ওহাবীদের প্রধান কেন্দ্র আর দ্বিতীয় কেন্দ্রটি গড়ে উঠল মালদহে। এ সময় মওলবী বেলায়েত আলী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশাল এলাকায় এবং পাটনার এনায়েত আলী পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, রংপুর এলাকায় কট্টর রক্ষণশীল ওহাবী মতাদর্শ প্রচার ছাড়াও অসংখ্য বাঙালি মুসলমান যুবককে মুজাহিদ হিসেবে সংগ্রহ করেন।

অনেক গবেষক দ্বিমত পোষণ করলেও এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ হান্টার রচিত "আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে বর্ণিত মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

'পূর্ব বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবী প্রচারকেরা সাধারণতঃ বিশ বছরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে অনেক সময় তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র ও শোক প্রবিষ্ঠ করিয়েছে। আর আশা-ভরসাস্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবী পিতার বিশেষ গুণবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রাণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না, কোন সময়ে তার পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে।[100] এইভাবে যেসব যুবককে উধাও

[100] তারমানে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং মুজাহিদগণ ওহাবী ছিলেন না।

করা হয়েছে তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে। (অনুবাদ: আবদুল ওদুদ)[101]

মৌলবি আশরাফুজ্জামান যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে গেছেন:

"কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সৈয়দ ব্রেলভী প্রথম জীবনে সরদার আমীর খানের দলভুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি অসি বিদ্যা ও অশ্ব চালনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। উপরত্ব ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার তীব্র ঘৃণা-আক্রোশের সৃষ্টি হয়। এদিকে সরদার আমীর খান ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বেরেলী থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করে তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শাহ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি রোহিলা খণ্ডসহ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং বহু ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা দান করেন। ১৮১৮ সালে তিনি পাটনায় একটি শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। জনসমাবেশ হয়।"

"পবিত্র হজ যাত্রার প্রাক্কালে সৈয়দ সাহেব এ মর্মে সংবাদ লাভ করেন যে, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে সেখানকার শিখ শাসন কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধাদান ছাড়াও নানা ধরনের অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছে। তিনি বিধর্মী শিখদের এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে অর্থ এবং বিরাট সংগঠনের। ফলে তিনি পাটনা কেন্দ্রের দুইজন বিশ্বস্ত অনুসারী শাহ ইসমাইল ও আবদুল হাইকে তার প্রতিনিধি বা

[১০১] এম.আর.আখতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪, পৃ. ৮৬-৮৭

খলিফা নিযুক্ত করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার অব্যাহত রাখা ছাড়াও অত্যন্ত সঙ্গোপনে জেহাদের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। পরবর্তীকালে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অত্যন্ত গোপনে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি সংগঠন সৃষ্টি এবং বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মুজাহিদ রিক্রুট ও নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মতে পবিত্র হজ্ব পালনের পর সৈয়দ সাহেব মধ্যপ্রাচ্যে বহু দেশ সফর করেন এবং একমাত্র কনস্তান্তিনোপলেই (ইস্তাম্বুলেই) শিষ্য ও দর্শনার্থীদের নিকট থেকে নয় লক্ষাধিক টাকা নজরানা পেয়েছিলেন।

"কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবার তার মুখে উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে "মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম।" অর্থাৎ খ্রিস্টান ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষ হচ্ছে "দারুল হরব" বিধর্মীর এলাকা। তার এই মতবাদ-এর আরও ব্যাখ্যাদান করলে বলতে হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ খ্রিস্টানদের পদানত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই "দারুল হরব"-এ ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়।"

"প্রায় তিন বছর ধরে তিনি সবার অলক্ষ্যে এই জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সদলবলে ইংরেজদের করদ রাজ্য টংক-এ উপস্থিত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তার সক্রিয় সমর্থনে দুর্গম এলাকার মাঝ দিয়ে সৈয়দ আহমদ তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আফগান এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মুসলমানদের সমর্থনে এখান থেকেই শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ-এর শাসনাধীন পাঞ্জাব আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা।"

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের অন্যান্য দলীল মূল রেফারেন্সের সাথে মিলিয়ে দেখলে বহু বেমিল পাওয়া যাবে বলে আমাদের ধারনা প্রবল।

১৬ নাম্বার দলীলেও মারাত্মক প্রতারণা

'ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন' লিখক ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, প্রকাশক-মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড বাংলা বাজার ঢাকা। পৃ. ৩/৪,তরিকা-ই মুহাম্মাদিয়া বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন''--- ''তথাকথিত ওহাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবী মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ।'

কারো কারো মতে ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওয়াহাবিদেরই।

ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওহাবি আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ।

'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-এখান থেকে শুরু করে সামনে কিছু তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন তার অন্তরের কপটতার লক্ষণ। ওহাবি-ওহাবি বারবার উল্লেখ করার পরেও এ ধরনের উক্তি হাস্যকর বৈকি।'

আমাদের কথা:

'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-এখান থেকে শুরু করে সামনে কিছু তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন তার অন্তরের কপটতার লক্ষণ। ওহাবি-ওহাবি বারবার উল্লেখ করার পরেও এ ধরনের উক্তি হাস্যকর বৈকি' - এই কথা আশরাফুজ্জামানের। মূলতঃ ড. ইনাম-উল-হক প্রমাণ করেছেন ভারতীয় জেহাদী আন্দোলন আরবের ঐ

ওহাবী আন্দোলন নয়, কিন্তু আশরাফুজ্জামানের তা পছন্দ হয়নি, তাই একটু শাসন করলেন ড. ইনাম-উল-হক সাহেবকে। ইনাম-উল-হক সাহেবকে দিয়ে দলীলও দিবে আবার গোস্বাও করবে!! **আপনারাই দেখুন বেরলভী মোল্লার প্রতারণা। দেখুন মূল বইয়ের সম্পুর্ণ আলোচনা।** প্রতারণা বুঝার জন্য আশরাফুজ্জামানের উল্লেখিত অংশ বোল্ড অক্ষরে দেয়া হল:

'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া বা তথাকথিত ওহাবি আন্দোলন

তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবি মুসলমানদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[102] পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ভারতে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজবিরোধী যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, সাধারণত তা ছিল কোনো রাজা বা জমিদারকে কেন্দ্র করে। ইংরেজের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ, ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ এবং বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজা বা জমিদারের স্বার্থে বা নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। ওহাবি আন্দোলন কিন্তু এর ব্যতিক্রম। কোনো রাজা বা রাজপুরুষের স্বার্থে বা নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের বিভিন্ন উচ্চ-নিচ, ধনী-দরিদ্র মুসলমান এবং এসব সংগঠন পরিচালনা করেছিল ধর্মশাস্ত্রবিদ আলেম সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজবংশের কয়েকজন এতে যোগ দিলেও দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো সময়েই এর শক্তি কোন রাজা বা নবাবের স্বপক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়নি।

---

[১০২] তথ্য গোপন শুরু।

কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও এ আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের এক অংশ ক্রমশ ওহাবি অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ভারতের অন্যান্য সংগ্রামীদেরকে এই সচেতনতা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণাই পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয় বলে মনে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করে এবং ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। **কারো কারো মতে, ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওহাবিদেরই।**

ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা আলোচনাসাপেক্ষ।[103] হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়াই লক্ষ্য বিধায় এ আন্দোলনের নাম তারীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলন। আঠারো শতকে হেজাজে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সংস্কারমূলক কার্যাবলিকে ইংরেজরা ভারতবর্ষের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং এদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করে, যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে আরবের ওহাবীদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তাই ভারতের তরীকা-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনকে এদেশের

[103] এরপর এই চাপ্টারের আর কিছু উল্লেখ না করে মৌলবি আশরাফুজ্জামান ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হকের প্রতি তাঁর পরবর্তী আলোচনার জন্য বিষোদগার করেন এই ভাবে- 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে-এখান থেকে শুরু করে সামনে কিছু তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন তার অন্তরের কপটতার লক্ষণ। ওহাবি-ওহাবি বারবার উল্লেখ করার পরেও এ ধরনের উক্তি হাস্যকর বৈকি।'

মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তরিকা-ই-মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের নেতা ও অনুসারীদের ইংরেজরা ওহাবী হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতে সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকারী শাহ ওয়ালিউল্লাহ যখন কয়েক বছর মক্কায় বিদ্যা শিক্ষার্থে অবস্থান করছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবও সে সময় মক্কায় পড়াশুনা করছিলেন। এদের সাক্ষাৎ যোগাযোগের কোনো নজির পাওয়া যায় না, তবে মক্কার বিদ্যোৎসাহী সমাজের যে চিন্তাধারা ওহাবি নেতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তার সঙ্গে ওয়ালিউল্লাহর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর রচনাবলিতে তার আভাস পাওয়া যায়। অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ বলেন, নেহায়েত সুবিধার জন্য এ আন্দোলনকে ওহাবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হান্টারও তার গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওহাবি নাম দেন। আসলে আঠারো শতকের শেষভাগে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব যে নীতিনিষ্ঠ (Puritanic) আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সাথে ভারতীয় মুসলমানদের এই আন্দোলনের অনেক পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের কখনই ওহাবি বলে পরিচয় দেননি। সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তার অনুগামীরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেন না এবং তারা নিজেদেরকে সুন্নী অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নতের অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে আগ্রহী। পীর-ফকির ও আস্তানা পূজার বিরুদ্ধাচরণ করা আরবের ওহাবিদের প্রধান নীতি, ১৮০২ সালে এই ওহাবিরা মদীনায় মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কবর পর্যন্ত ভাঙতে কুণ্ঠিত হয়নি। ভারতের ওহাবী নেতারা অনেকেই পীর এবং কবর- আস্তানার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোকে ঘোর পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেননি। অকৃত্রিম ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আরব ও ভারতের ওহাবি আন্দোলন আপোষহীন ও অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনেকের ধারণা, আধুনিক মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের সূচনা হয়

ওহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে’।[104]

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দলীল ২১ এর পোস্টমর্টেম

দেখুন মুখোসের অন্তরালে পৃষ্ঠা ২০

।।২১।।

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

‘শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব’

عقيدته السلفية ودعوته الاصلاحيه وثناء العلماء عليه

তার সালাফী আক্বীদা ও সংশোধনী দাওয়াহ এবং তার ব্যাপারে আলেমদের প্রশংসাবলি بقلم লিখক

العلامة الشيخ احمد بن حجربن محمد ال ابوطامى ال بن علي

আল্লামা শায়খ আহমদ বিন হাজর বিন মুহাম্মদ আল-ই আবু ত্বামী আল-ই বিন আলী

(قاضى المحكمة الشرعية بقطر)

(কাজী (বিচারক) কাতার শরঈ বিচার বিভাগ)

বাদশা ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ-এর নির্দেশে প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরণকৃত, গ্রন্থটির পৃষ্ঠা নং-৭৮/৭৯

وكماغزت الدعوة الوهابية السودان كذالك غزت الدعوة بعض المقاطعات الهندية ـ بواسطة احد الحجاج الهنود ـ وهو السيد احمد ـ وقد كان هذا الرجل من امراء الهند، وذهب الى الحجاز لاداء فريضة الحج بعد ان اعتنق الاسلام ، سنة ١٨١٦م فلما التقى بالوهابيين، فى مكة اقتنع بصحة مايدعون اليه واصبح من دعاة المذهب الذين تملكهم الايمان ، وسيطرت عليهم العقيدة ـ

ولما عادسنة ١٨٢٠م الى وطنه فى الهند بجهة البنغال ، وجد ميدانا صالحا للدعوة، بين سكان المنطقة من الهنود المسلمين الذين اختلطت عقائدهم وتقاليدهم الدينية، بالكثير من عقائد الهندوس وعوائدهم ـ

فابتدأ الدعوة فى مدينة (بتين) ودعا اخوانه المسلمين ليؤمنوا بمبادئ الاسلام الصحيحة، ويتركوا البدع والعقائد الهندوسية التى كانت شائعة بينهم، وبعد مرحلة من الجهاد، استطاع هؤلاء المسلمون الوهابيون ان

মুখোসের অন্তরালে। # ২১

يقيموا الدولة الاسلامية على اساس من المبادئ الوهابية بجهة البنجاب ـ تحة حكم الداعيه السيد احمد ـ

ولم تلبث هذه الدولة طويلا حتى قضى عليها الاستعمار الانكليزى فى العقد الرابع من القرن التاسع عشر ـ

ولكن الدعوة الوهابية ظلت قائمة هناك على يدخلفاء السيد احمد من بعده ، ولم يستطع المستعمرون ان ينالوا منها ـ

ولايزالواالكثيرون من سكان هذه المناطق يدينون بالاسلام على المذهب الوهابى ـ

অর্থাৎ যেভাবে সুদানে ওয়াহাবি মতবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ঠিক সেভাবেই হিন্দুস্থানের কিছু কিছু এলাকায় এ মতবাদ প্রচারিত হয়েছে একজন ভারতীয় হাজীর বদৌলতে। আর তিনি সৈয়দ আহমদ। ইনি হিন্দুস্থানের একজন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি। তিনি ফরজ হজ্ব আদায় করার জন্যে হেজাযে গিয়েছিলেন ‘ওয়াহাবি ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৮১৬ খৃস্টাব্দে।

অতঃপর যখন মক্কায় ওয়াহাবিদের সাথে তার সাক্ষাত হল তাদের ওয়াহাবি দাওয়াতকে তিনি মনেপ্রাণে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিলেন এবং ওহাবি আক্বীদা-বিশ্বাস যাদের মনেপ্রাণে বদ্ধমূল হয়ে গেছে তিনি তাদেরই একজন দা-ঈ (মুবাল্লিগ বা প্রচারক) বনে গেলেন।

আর যখন ১৮২০ সালে নিজ দেশে বাংলার এলাকা দিয়ে ফিরে আসলেন তখন ঐ এলাকার ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবিয়্যাত প্রচারের জন্য এক উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে গেলেন। যাদের ধর্মীয় আক্বীদা ও আমলগুলো বেশীরভাগ ভারতীয় হিন্দুয়ানী আক্বীদা ও পূজা/পার্বনের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর তিনি পাটনা শহর থেকে ওয়াহাবিয়াতের দাওয়াত আরম্ভ করলেন। তিনি তার মুসলিম ভাইদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামের (ওয়াহাবি মতাদর্শ) নিয়মকানুনগুলো মানতে এবং বিদ'আত পরিহার করতে ও হিন্দুয়ানী আক্বীদা-আমল যা তাদের মাঝে প্রচলিত আছে বর্জন করতে আহ্বান করলেন।

দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর এই ওয়াহাবি মুসলমানেরা সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে পাঞ্জাব এলাকায় ওয়াহাবিয়্যাতের নিয়ম কানূনের উপর ভিত্তি করে একটি (ওয়াহাবি) ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

তবে এই ওয়াহাবি হুকুমত দীর্ঘদিন স্থায়ি হয়নি। সাম্রাজ্যবাদি ইংরেজরা ১৯০৪ সালে তাদের উপর কব্জা করে বসে।

তবে সৈয়দ আহমদের পরে তার খলিফাদের দ্বারা ওয়াহাবিয়্যাতের এ দাওয়াত ও মতবাদ এখনও বহাল আছে। সাম্রাজ্যবাদি শক্তি এদের মূলোৎপাটন করতে পারেনি।

এ সমস্ত এলাকার অধিকাংশ মানুষ এখনও ওয়াহাবি মতাদর্শের ভিত্তিতেই তাদের ইসলাম ধর্ম পালন করে যাচ্ছে।

[104] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ৩-৪

প্রাথমিক পোস্টমর্টেম

জাস্টিস আহমাদ বিন হাজার বিন মুহাম্মাদ এর এই লেখাটি যে অত্যন্ত দূর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তার **একটি প্রমাণ** হল সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে একটি লাইন,

' وَذَهَبَ إلى الحِجَاز لأدَاءِ فَرِيْضَةِ الحَجِّ بَعْدَ أنْ اعْتَنَقَ الإسْلامَ سَنَةَ ১৮১৬ "

অর্থাৎ, ‘তিনি (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) ১৮১৬ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর হজ্জের ফারাইদ্ব আদায় করার জন্য হেজায যান’। কত হাস্যকর এই তথ্য। সাইয়িদ আহমাদ শহীদ প্রমাণিত একজন সাইয়িদ, খান্দানে রাসূল, পিতার নাম সাইয়িদ ইরফান!!

অবশ্য মৌলবি আশরাফুজ্জামান অনুবাদ করছেন অন্যভাবে। একটি কামিল মাদ্রাসার একজন মুহাদ্দিসের এই যদি হয় আরবী ভাষা জ্ঞান, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। দেখুন তার অনুবাদ:

‘তিনি ফরজ হজ্জ আদায়ের জন্যে হেজাযে গিয়েছিলেন **‘ওয়াহাবি ইসলাম’ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৮১৬** খৃস্টাব্দে’।

দ্বিতীয় প্রমাণ হল আরেকটি বাক্য,

وقَدْ كَانَ هذا الرَّجُلُ مِنْ أمَرَاءِ الهِنْدِ

‘তিনি (সাইয়িদ আহমাদ শহীদ) ছিলেন হিন্দুস্তানের একজন আমীর’।

বাস্তবতা হল, তিনি হিন্দুস্তানের কোন আমির ছিলেন না।

অনুবাদে আরো বেশ খেয়ানত করেছেন মৌলবি আশরাফুজ্জামান।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভীর জবাব

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী তার *‘তাহকীক ও ইনসাফ কি আদালত মে এক মুসলিহ কা মুকাদ্দামাহ’* কিতাবের ৫৫

পৃষ্ঠায় জাস্টিস সাহেবের বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন। দেখুন স্ক্রিনশট

৫৫

بطورِ نمونہ ایک ایسے عالم کی کتاب کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے جس کو عام اشاعت و تقسیم کے لیے حکومتِ سعودیہ نے شائع کیا اور اس پر وہاں کے ایک جلیل القدر عالم کا مقدمہ بھی ہے۔ علامہ احمد بن حجر بن محمد (قاضی محکمۂ شرعیہ قطر) اپنی کتاب الشیخ محمد بن عبدالوہاب کے صفحہ ۸۰ پر لکھتے ہیں :

"اس طرح سے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت نے ہندوستان کے بعض علاقوں کو متاثر کیا۔ یہ کام ایک ہندوستانی حاجی سید احمد کے ذریعہ عمل میں آیا۔ یہ شخص ہندوستان کے والیانِ ریاست میں سے تھا جس نے ۱۸۱۶ء میں اسلام قبول کرنے کے بعد فریضۂ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز کا سفر کیا جب ان کی وہاں مکہ میں وہابیوں سے ملاقات ہوئی تو وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ ان کی دعوت بہت صحیح اصولوں پر قائم ہے اور وہ ان کے مذہب کے ایسے پُرجوش و مخلص داعی بن گئے جن کے دل و دماغ پر عقیدہ حاوی ہو جاتا ہے۔" [2]

یہ درحقیقت مغربی مصنفین کی خوشہ چینی اور مکمل طریقہ پر انھیں کی بیانات پر اعتماد اور تحقیقِ حق کی براہِ راست کوشش نہ کرنے کا افسوسناک نتیجہ ہے جس کا شکار ڈاکٹر احمد امین [3]

---

[1] سید لکھنے کے بعد مصنف کو یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ وہ پشتینی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ان کے اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب تھا ؟

[2] "الشیخ محمد بن عبدالوہاب" مطبعۃ الحکومۃ مکہ مکرمہ ص۸۰ (۱۳۹۵ھ) سید صاحب کے تذکرے اور ان کی سرگرمیوں کے لیے جن میں اسی انداز سے واقعات بیان کیے گئے ہیں ص۸۹ بھی ملاحظہ ہو۔

[3] ملاحظہ ہو کتاب المهدوية والمهديون ۔

جیسے فاضل مصنف (جن کے قلم سے فجرالاسلام، ضحی الاسلام، ظہرالاسلام جیسا مشہور و مقبول سلسلہ نکلا ہے) اور بعض دوسرے عرب مصنفین ہوئے۔ جنھوں نے تمامتر انگریزی فرانسیسی مآخذ پر انحصار رکھا۔

مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر احمد امین کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب "زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث" میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

"ہندوستان میں ایک وہابی رہنما و قائد پیدا ہوا جس کا نام سید احمد تھا۔ اس نے ۱۸۲۲ء میں فریضۂ حج ادا کیا وہاں اس نے پنجاب میں اس دعوت کا علم بلند کیا اور وہاں تقریباً وہابی اقتدار قائم کرلیا۔ اسکی قوت و طاقت بڑھتی رہی یہاں تک کہ شمالی ہندوستان کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہونے لگا۔ اس نے بدعات و خرافات کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا اور اس علاقہ کے وثنیین و اہل دین سے جنگ کی اور ہر اس شخص کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا جو ان کے مذہب پر عمل پیرا اور ان کی دعوت کا حامل نہ ہو، اس نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ انگریزی حکومت کو اس کی اور اس کے پیروکاروں کی وجہ سے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر وہ ان کے دبانے میں کامیاب ہوئی" [1]

شاید ان تاریخی غلطیوں (اگر ہم ان کو مغالطوں کا نام نہ دیں) کی تعداد اس مختصر اقتباس میں اس کی سطروں سے کم نہ ہوگی، اور یہ وہ باتیں ہیں جن میں کسی بحث و تحقیق کا سوال نہیں۔ ہر وہ شخص جس کو سید صاحبؒ کی سیرت، ان کی تحریکِ جہاد و دعوت، نیز

[1] زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث ص۲۱

اس عہد کی عمومی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت ہے وہ بداہتہً ان کو جانتا اور سمجھتا ہے —

ان غلطیوں کی وجہ یہی تھی کہ یہ معلومات انگریزی مآخذ سے ماخوذ تھیں جس میں کلی طور پر انھیں پر انحصار کیا گیا تھا اور اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ ان کی سیرت و کارناموں کا، اور تاریخ دعوت و جہاد کا اچھی طرح اور مکمل مطالعہ کیا جائے یا ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کی جائیں جو ہندوستان کی شخصیتوں سے واقف ہیں اور جن کا گاہ بگاہ مصر جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہندوستان کے مصلحین کی صف اول میں سر سید احمد خاں اور سید امیر علی کے بجائے وہ ان کو جگہ دیتے۔ میں نے ۱۹۵۱ء میں اپنے سفرِ مصر کے دوران ان کی توجہ ان غلطیوں کی طرف مبذول کرائی۔ میں نے انھیں یہ بھی بتایا کہ سید صاحبؒ اور شاہ اسمٰعیل شہیدؒ کس مرتبہ کے لوگ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کے تذکرہ میں انھوں نے سید صاحبؒ کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ انھوں نے اعتراف کیا کہ ان دونوں کے بارے میں ان کی معلومات ناکافی تھیں اور ان کو فکرِ اسلامی کی تاریخ میں ان کی اہمیت اور مسلم معاشرہ میں ان کے ہمہ گیر اثرات کا اس قدر اندازہ نہ تھا۔ [1]

ہمارے عرب و مسلم مصنفین و اہلِ قلم کی یہ وہ تحریریں ہیں جن کو پڑھ کر ایک عرب شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے ؎

وظلم ذوی القربیٰ أشد مضاضةً　　علی النفس من وقع الحسام المهند

بعض اکابر معاصرین کی شہادتیں

کسی شخص کی عظمت اور اصل حیثیت و مرتبہ کا اندازہ اس کے صاحبِ نظر معاصرین

[1] دیکھیے کتاب "شرقِ اوسط کی ڈائری" از مصنف

সাইয়িদ নদভী এখানে বলেছেন, কাতারের কাজী বা এমন আরো যারা লিখেছেন, তাদের ভিত্তি ছিল ইসলাম-বিদ্বেষী ইংরেজ লেখকদের লেখা। নদভী সাহেব আরো বলেছেন তাঁর

মিশর সফরের সময় ঐসব আরব লেখকদের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা স্বীকার করেন তাদের কাছে পরিমিত তথ্য ছিল না। [105]

দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস. সীমান্তে[106] বিদ্রোহী[107] শিবির – মিষ্টার হান্টার

(নোট: হান্টার যেসব শব্দে সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে উল্লেখ করেছেন; দস্যু, লুঠেরা, বিদ্রোহী, রাজদ্রোহী, বৃটিশবিরোধী, পীর, তেজস্বী পুরুষ, শিখ বিরোধী, ধর্মান্ধ, ধর্মীয় নেতা, ইমাম, অলি পয়গম্বর, আব্দুল ওয়াহাবের ধর্মান্ধ সাগরেদ। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা)

“বাংলার মুসলমানরা আবার এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে । আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের উৎপাত চলেছে বহু বছর যাবত। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা আমাদের শিবির আক্রমণ করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের[108] হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে তিন – তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে । আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে ওঠা শত্রু – বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে । বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত

১০৫ আবুল হাসান আলী নদভী, *তাহকীক ও ইনসাফ কি আদালত মে এক মুসলিহ কা মুকাদ্দামাহ,* লাহোর: সায়্যিদ আহমদ শহিদ একাডেমি, ১৯৭৯, পৃ. ৫৫ – ৫৭

106 সীমান্ত এখন তাদের হয়ে গিয়েছে। মাতৃভুমির সন্তানেরা এখন নিজ দেশে বিদেশী। -মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

107 নিজ দেশে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদরা বিদ্রোহী হয়ে গেল বৃটিশের কাছে। -মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

108 দখলদার বৃটিশ ভারতবাসীকে প্রজা বলছে। -মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে , আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল, পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্মমণ্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের[109] নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে । সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব–দ্বীপ অঞ্চল থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয় আমাদেরই তৈরি করা রাস্তা দিয়ে । তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী বহু লোক এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে । সুকৌশলে অর্থ পাচারের এমন এক পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করেছে, যাতে রাজদ্রোহের চরম বিপদসংকুল অভিযান রূপান্তরিত হয়েছে নিরাপদ ব্যাংক ব্যবসার আদান – প্রদানে।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্মান্ধ তারা এইভাবে রাজদ্রোহিতামূলক প্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে । আর এই বিদ্রোহের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে প্রকাশ্যেই শলা – পরামর্শ করছে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়। বিগত নয় মাস যাবত বাংলার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোর পৃষ্ঠাসমূহ ভর্তি হয়েছে রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনায়। উত্তর ভারতের মুসলমানী আইনবিশারদ ব্যক্তিগণের সমষ্টিগত অভিমত সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় একটি ফতোয়ারূপে। এর পরেই বাংলার মুসলমানরা এই বিষয়টি সম্পর্কে এক প্রচারপত্র বিতরণ করে। এমনকি ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যে শিয়া সম্প্রদায় তারাও এই প্রচার অভিযান থেকে বিরত থাকতে

109 বৃটিশবিরোধী মুজাহিদ বাহিনী। কয়েক লাইন পরেই সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র কথা উল্লেখ করবে। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

পারেনি । মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত রাজানুগত[110] তারা এই রাজদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত থাকলে তাদের আখেরাত নষ্ট হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেভাবে গলদঘর্ম হয়ে চেষ্টা করছিল , তা দেখে ইঙ্গ–ভারতীয় সংবাদপত্র কয়েক মাস হাসি সম্বরণ করতে পারেনি।[111] কিন্তু মুসলমানী আইনবিশারদ পণ্ডিতদের সার্বিক ফতোয়া জারির পর আমাদের দেশবাসী নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেন যে, বিষয়টা একদিকে যেমন গুরুতর তেমনি অপরদিকে নিতান্তই হাস্যকর। মুসলমানদের প্রণীত ও প্রচারিত যাবতীয় প্রচার–পত্রাদি থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারত সম্রাজ্য এক বিপদ–সংকুল অবস্থা অতিক্রম করছ । বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষ বর্তমান অবস্থায় অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে , মুসলমানদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অধিক বেপরোয়া তারা বহু বছর যাবত প্রকাশ্য রাজদ্রোহিতায় লিপ্ত আছে।[112] পক্ষান্তরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা সর্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক প্রশ্নে আলোড়িত হচ্ছে। মুসলমানী আইনে বিদ্রোহকে আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্যভাবে একটি অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে । কোনো – না – কোনোভাবে যেন প্রত্যেকটি মুসলমানের প্রতি নির্দেশ জারি হয়েছে বিদ্রোহের প্রশ্নে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার। স্ব–ধর্মাবলম্বীদের কাছে স্পষ্ট করে তাকে বলতে হবে, আমাদের সীমান্তের বিদ্রোহী শিবিরের প্রতি তার সমর্থন আছে কিনা, **তাকে চূড়ান্তভাবে স্থির**

---

[110] কারা তারা, জাতির আজ মোটেও অজানা নয়। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[111] আহারে উপহাস!!! বৃটিশমিত্র হলে কি হবে, তারা উপহাস করতে ভুল করল না। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[112] বিষ ডেলিভারী অব্যাহত। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

করতে হবে সে ইসলামের একাগ্র অনুসারীর ভূমিকা পালন করবে, না রাণীর শান্তিকামী প্রজার ভূমিকা পালন করবে। এই প্রশ্নে মুসলমানরা যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেজন্যে তারা কেবলমাত্র ভারতের মুসলমানী আইনবিশারদগণের সঙ্গেই নয়, মক্কার পণ্ডিতগণের সঙ্গেও শলা–পরামর্শ করেছে । ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্রোহে যোগদান করা–না করার প্রশ্নটি আরবের পবিত্র নগরীর ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে মাসের পর মাস যাবত আলেচিত হয়েছে । আমাদের মুসলমান প্রজাদের[113] মধ্যে এই অসন্তোষের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এর তিনটি প্রবণতার বিষয় তুলে ধরতে চাই । **প্রথমত যেসব ঘটনার ফলে আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল, সংক্ষেপে তার বিবরণ দান করব এবং সেই বিদ্রোহী উপনিবেশ বৃটিশ শক্তিকে ক্রমাগতভাবে যেসব বিপদে জড়িয়ে ফেলেছিল, তার কতকগুলো পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করব।** দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে রাজদ্রোহী সংগঠনের মাধ্যমে বিদ্রোহীরা ভারত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ এলাকাসমূহ থেকে অর্থ ও জনবলের অবিরাম সরবরাহ লাভ করত সে সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দরুন যেসব আইনগত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো বিবৃত করব। বিদ্রোহের প্রবক্তারা তাদের নীতিকথার যে বিষ ছড়াতো এবং মুসলমান জনসাধারণ কিভাবে তা সাগ্রহে পান করত, আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক তাদের পবিত্র আইনের সঠিক ব্যাখ্যার[114] মাধ্যমে বিদ্রোহে যোগদানের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য কিভাবে আকুল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হত, এই আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । কিন্তু কেবলমাত্র এই আলোচনা

---

[113] তাদের মুসলমান “প্রজা”!!! কারা তারা? – মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

[114] আহারে হান্টার তুমি চিনিলে কেমনে? – মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

করেই যদি বক্তব্য শেষ করি, তাহলে শুধু অর্ধেক সত্য উদঘাটিত হবে। ভারতের মুসলমানরা বহুদিন থেকেই ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতি একটা অবিরাম বিপদের উৎসরূপে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে । অপেক্ষাকৃত নমনীয় হিন্দু সম্প্রদায় যেসব পরিবর্তন সানন্দচিত্তে মেনে নিয়েছে , মুসলমানরা সেগুলোকে মনে করেছে মহা অন্যায় । সুতরাং ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলমানদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ এবং এই অসন্তোষ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে আমি আলোকপাত করব এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ।

পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সৈয়দ আহমদ

পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সৈয়দ আহমদ।[115] অর্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিণ্ডারী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়জন তেজস্বী পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল , সৈয়দ আহমদ তাদের অন্যতম।[116] কুখ্যাত এক দস্যুর[117] অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে সে জীবন আরম্ভ করে

[115] বৃটিশ ভারতের রায় বেরেলী জেলার বাসিন্দা। জন্ম ১২০১ হিজরি মহররম, খ্রি. ১৭৮৬। - হান্টার
-বৃটিশবিরোধী লড়াকু সেনাপতি আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদুনা সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[116] মিস্টার হান্টার তুমি কিন্তু দুমুখী আমরা জানি। এখানে সাইয়িদ সাহেবের প্রশংসা করলেও অন্যত্র তুমি তোমার নিজেরই বিরোধিতা করেছো। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[117] আমির খান পিন্ডারী, পরবর্তীতে টংকের নওয়াব। - হান্টার
-আমির খান। পরবর্তীতে সে বৃটিশের সাথে সন্ধি করেছিল। সন্ধির পর আমির খান দস্যু নয়, বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

এবং বহু বছর যাবত মালওয়া অঞ্চলের আফিমসমৃদ্ধ গ্রামসমূহে লুটতরাজ চালায়। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে উদীয়মান শিখ শক্তি তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের উপর যে – কঠোর নির্দেশ জারি করে, তার ফলে মুসলমান দস্যুদের কার্যকলাপ বিপদসংকুল হয়ে পড়ে এবং লাভজনক থাকে না । পক্ষান্তরে শিখদের গোঁড়া হিন্দুয়ানীর দরুন উত্তর ভারতের মুসলমানদের উৎসাহে ইন্ধন সৃষ্টি হয়। **সৈয়দ আহমদ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।** দস্যুবৃত্তি[118] ত্যাগ করে[119] ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সে দিল্লীতে চলে যায় মুসলমানী আইনের একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত[120] ব্যক্তির[121] কাছে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। তিন বছর সেখানে শিক্ষানবিসীর পর সে নিজেই একজন প্রচারক হিসেবে কাজ শুরু করে। **ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে যেসব কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছিল, সাহসের সঙ্গে সেগুলোর বিরুদ্ধে সে আক্রমণ চালাবার ফলে দুর্ধর্ষ একদল ভক্ত অনুসারী তার পশ্চাতে সমবেত হয় ।** সর্বপ্রথম সে তার প্রচার অভিযান শুরু করে রোহিলাদের[122] বংশধরগণের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই রোহিলাদিগকে নির্মূল করার জন্য অর্থের বিনিময়ে অন্যায়ভাবে

[118] কারণ তিনি তোমাদের আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন তাই দস্যু। তাইনা মিস্টার হান্টার? – মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[119] কেন ত্যাগ করলেন? মিস্টার হান্টার গোপন করে গেলেন যে, আমির খানের সাথে তাদের অর্থাৎ বৃটিশদের মিত্রতা হয়ে গেলে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাগ করে আমির খানকে ত্যাগ করে চলে যান। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[120] শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী।– মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

[121] শাহ আব্দুল আজীজ। - হান্টার।

[122] রোহিলাখন্ডের অন্তর্গত রামপুরার সন্নিকটে ফয়জুল্লাহ খানের জায়গীরে। - হান্টার।

আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। রোহিলাদের করুণ ইতিহাস ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্রে এক অনপনেয়[123] কালিমা লেপন করে রেখেছে । বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত রোহিলাদের বংশধররা মৃত্যুপণ করে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। এখনো আমাদের সীমান্তের বিদ্রোহী উপনিবেশে নিয়োজিত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অসিচালক রোহিলা বীরেরা । ভারতে আমরা যেসব অন্যায় করেছি, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রোহিলাদের ক্ষেত্রেও আমরা লাভ করেছি সে অন্যায়ের উপযুক্ত প্রতিদান।[124]

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় নেতা ধীরে ধীরে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে । আধ্যাত্মিক মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ শিষ্যরা এই ভ্রমণকালে তার সেবাযত্ন করতে থাকে । সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান লোকরা পর্যন্ত সাধারণ ভৃত্যের মত নগ্নপদে তার পাল্কীর পাশে পাশে দৌড়ে অগ্রসর হয় । **পাটনায় দীর্ঘ যাত্রা বিরতিকালে তার অনুগামীর সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রীতিমত একটা সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।** যাত্রা পথে অবস্থিত বড় বড় শহরে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আদায়ের জন্য সে[125] প্রতিনিধি নিয়োগ করে কাফেলার আগে তাদের পাঠিয়ে দেয়। তদুপরি সে মুসলমান সম্রাটদের প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের অনুকরণে আনুষ্ঠানিক ফরমান জারি করে চারজন খলিফা নিয়োগ করে।[126] এইভাবে পাটনায় একটি স্থায়ী আস্তানা স্থাপনের পর সে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। গঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার সময় সে বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে এবং পথিপার্শ্বের সকল

---

১২৩ অপমানের হবে। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

১২৪ এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে।

125 সাইয়িদ আহমাদ শহীদ। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

126 মৌলবি বেলায়েত আলী, মৌলবি এনায়েত আলী, মৌলবি মরহুম আলী ও মৌলবি ফরহাত হোসেন। - হান্টার

বড় বড় শহরে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে । কলকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোক তার চারপাশে সমবেত হয় যে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে মুসাফাহা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মাথার পাগড়ী খুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে, পাগড়ীর যে কোন অংশ স্পর্শ করলেই সে ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব লাভ করবে । ১৮২২ খ্রষ্টাব্দে সে হজ্জ করতে মক্কা গমন করে । এইভাবে হজ্জের পবিত্র আবরণে সে তার প্রাক্তন দস্যু চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে পরবর্তী বছর অক্টোবর মাসে বোম্বাই হয়ে ফিরে আসে । বোম্বাই শহরেও ধর্ম প্রচারক হিসেবে সে কলকাতার মতই বিরাট সাফল্য অর্জন করে । কিন্তু ইংরেজদের একটি প্রেসিডেন্ট শহরের শান্তিপূর্ণ অধিবাসীবৃন্দ অপেক্ষাও উপযুক্ত ক্ষেত্র এই দস্যু দরবেশের সম্মুখে বিরাজমান ছিল । উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে তার নিজের জেলা বেরিলীতে সে বহুসংখ্যক অশান্ত প্রকৃতির লোককে[127] শিষ্য তালিকাভুক্ত করে নেয়। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সে পেশোয়ার সীমান্তের অসভ্য পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং পাঞ্জাবের শিখ অধ্যুষিত সমৃদ্ধ শহরগুলোতে পবিত্র জিহাদের বাণী প্রচার করতে থাকে ।

পাঠান উপজাতীয়রা উন্মত্ত আগ্রহ সহকারে তার আবেদনে সাড়া দেয়। মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত এবং সর্বাধিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই পাঠানরা ধর্মীয় অনুমোদনক্রমে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন করার সুযোগ পেয়ে অতিমাত্রায় আনন্দিত হয় । তখন পাঞ্জাব ছিল আধুনিককালের হিন্দু গোত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রমশালী শিখদের শাসনাধীন । সীমান্তবাসী ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় নেতার কাছে আশ্বাস লাভ করে যে, জিহাদে যারা বেঁচে থাকবে, তারা ঘরে ফিরতে পারবে লুণ্ঠিত সম্পদের মোটা পরিমাণ বখরা নিয়ে। আর যাদের মৃত্যু হবে,

---

127 শাহ মোহাম্মাদ হোসেন কর্তৃক দীক্ষিত। - হান্টার

তারা সেই মুহূর্তেই ঈমানদার শহীদ হিসেবে বেহেশতে স্থানলাভ করবে । কান্দাহার ও কাবুল অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার পথে সে জনসাধারণকে জাগ্রত করতে থাকে এবং সুকৌশলে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি[128] স্থাপনের মাধ্যমে তাদের উপর নিজের প্রতিপত্তি সুসংহত করে। **ধনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য তাদের ব্যাপক লুণ্ঠতরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।** ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে , শিখ থেকে আরম্ভ করে চীনবাসী পর্যন্ত দুনিয়ার সকল অবিশ্বাসীদের ধ্বংস সাধন করার জন্য সে ঐশ্বরিক আদেশ লাভ করেছে। পার্বত্য এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বৈষয়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন উপজাতীয় প্রধানদের সে প্রতিবেশী শিখ শক্তিকে দমন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশদভাবে বুঝাতে থাকে এবং এই প্রসঙ্গে হিন্দু রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অতীতে তীব্র ঘৃণাজনিত তার তিক্ত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে। এইভাবে ধর্মীয় ইশতেহার সাফল্যমণ্ডিত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর সে ধর্মপ্রাণ সকল মুসলমানের প্রতি জিহাদে যোগদানের জন্য আল্লাহর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানায়।

এই বিচিত্র প্রচারপত্রে বলা হয়:

শিখ জাতি দীর্ঘকাল যাবত লাহোরে এবং অন্যান্য স্থানে প্রভূত্ব করে আসছে । তাদের নির্যাতনের পরিমাণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং আরো হাজার হাজার মুসলমানের উপর তারা নিক্ষেপ করেছে স্তুপীকৃত লাঞ্ছনা। মসজিদ থেকে তারা আযান দিতে দিচ্ছে না এবং গরু জবাই করা তারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। তাদের এই অবমাননাকর স্বৈরাচার অবশেষে যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) ঈমান রক্ষা

[128] প্রধানত ইউসুফজাই ও সাবাকজাই উপজাতি। - হান্টার

করার একমাত্র উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হন। সেখানে গিয়ে তিনি নিস্পৃহতার নিদ্রায় মগ্ন মুসলমানদেরকে জাগ্রত করেন এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তাদের সাহস উজ্জীবিত করেন । আল – হামদু লিল্লাহ ! তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছে । ১৮২৬[129] খ্রীস্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ শুরু হবে।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের যেসব শহরে এই পীর বহুলোককে মুরীদ করে রেখে এসেছিল , সেসব স্থানে চর পাঠিয়ে জিহাদের আহ্বান প্রচার করা হয় । উপরে যে ইশতেহারটি উদ্ধৃত করা হল, সেটা অযোধ্যা প্রদেশে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।[130]

অতঃপর শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করে তা সঠিক বলা যায় না। উভয় পক্ষই নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। মুসলমান মুজাহিদ এবং শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যে তিক্ত ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনো স্থানীয় বহু আচার–আচরণে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। রণজিৎ সিং সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য এমন কয়েকজন সুদক্ষ সেনাপতিকে নিয়োগ করে, যারা নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পেশোয়ারের কৃষকদের মুখে ভাগ্যবান ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল আভিতাবিলির[131] নাম এখনো শুনতে পাওয়া যায়।

[১২৯] ২০শে জমাদিউস সানী, ১২৪২ হি:। - হান্টার

[130] কনৌজের জনৈক মৌলবি প্রণীত “*তারগিব-উল-জিহাদ*”। - হান্টার

[131] জাতীয়তা ও নামের বানান যেরূপ প্রচলিত আছে, সেরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। - হান্টার।

মুসলমানরা সমতল এলাকায় একাদিক্রমে হামলা চালাতে থাকে এবং যেখানেই তারা হামলা করে সেখানেই হত্যা ও অগ্নি সংযোগের ধ্বংসলীলা সাধন করে । পক্ষান্তরে গ্রামবাসী বীর শিখরা সামগ্রিকভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পার্বত্য ধর্মান্ধদের পরাভূত করে এবং জানোয়ারের মত তাড়া করে তাদের পার্বত্য নিবাসে ফেরত পাঠায়। সেকালের ক্রোধোন্মত্ততার ফলে যে ভয়াবহ ভূমি রাজ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল । রক্তের বিনিময়ে ভূমিস্বত্ব — তার নমুনা এখনো বিদ্যমান আছে । সীমান্তের হিন্দু অধিবাসীরা আজো গর্বের সঙ্গে প্রদর্শন করে সেকালের পত্তনি পাট্টা , যার বলে তাদের গ্রাম পত্তন দেওয়া হয়েছিল হোসেন খেল উপজাতীয়দের একশো মাথা বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে।

নিয়মিত যুদ্ধে সুশৃংখল শিখ বাহিনীর সঙ্গে কোলাহলময় মুসলমান সৈন্যদের কোন তুলনা ছিল না । ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান ধর্মীয় নেতা তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিখদের একটি পরিখাবেষ্টিত শিবির আক্রমণ করে। শিখরা বহু সংখ্যক মুসলমান হত্যা করার পর এই আক্রমণ প্রতিহত হয়। কিন্তু সমতলবাসী শিখ সেনাপতি তার এই বিজয় অব্যাহত রাখতে পারে না। ধর্মান্ধ মুসলমানরা সিন্ধু নদীর অপর পারে গিয়ে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকে। গেরিলা যুদ্ধে সাফল্যের দরুন তাদের প্রতাপ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, শিখ সর্দার তখন আক্রমণকারী উপজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ১৮২৯ সালে সমতলবাসীরা তাদের সীমান্ত রাজধানী পেশয়ারের নিরাপত্তা রক্ষা করার ব্যাপারে ভীত – সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে । তখন সেখানকার গভর্নর[132] মুসলমান নেতাকে বিষ প্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধ অবসানের হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফলে পার্বত্য মুসলমানদের উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে ।

[132] গভর্নর মুসলমান হলেও রণজিৎ সিংহের হাতের পুতুল ছিল। - হান্টার

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা সমতল অঞ্চলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কাফের সৈন্যবাহিনীকে নিধন করে ও তাদের সেনাপতিকে মারাত্মকভাবে জখম করে । তবে রাজপুত্র শের সিংহ এবং জেনারেল ভেনতুরার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী কোন প্রকারে পেশোয়ার রক্ষা করতে সমর্থ হয়। এর ফলে মুসলমান ধর্মনেতার প্রভাব কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের অসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গের সৈন্যবাহিনী তার শিবিরে সমবেত হয় । শিব রাষ্ট্রপ্রধান রণজিৎ সিং তখন তার কতিপয় শ্রেষ্ঠ কুশলী সেনাপতির অধীনে দ্রুত সেখানে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে একবার পরাজিত[133] হলেও মুসলমান বাহিনী বিপুল পরাক্রমে সমতল এলাকা পদানত করে। ঐ বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাব রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজধানী পেশোয়ার শহরের পতন ঘটে। এইখানেই শুরু হয় ধর্মীয় নেতার জীবনের শীর্ষস্থান লাভের মোড় পরিবর্তন। **সে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করে এবং স্বনামে মুদ্রার প্রবর্তন করে ও তাতে এই বাণী খোদিত করে 'ন্যায়পরায়ণ আহমদ, ঈমানের রক্ষক , যার শানিত তরবারির ঝলকানিতেই কাফের ধ্বংস হয়।**

অপরদিকে পেশোয়ার পতনের দরুন যে বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে রণজিৎ সিংহ তার অতুলনীয় কূটনীতি সমর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, ধূর্ত শিখ প্রধান ক্ষুদ্র মুসলিম রাজন্যবর্গের কাছে তাদেরই স্বার্থ রক্ষার আবেদন জানিয়ে তাদের সৈন্যদলকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুসলমান ধর্মীয় নেতা তখন মুক্তিপণের বিনিময়ে পেশোয়ারের দখল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া তার অনুগামীদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়েছিল, সেটা অনতিকাল মধ্যেই তার নিয়ন্ত্রণের

[133] জেনারেল এলার্ড এবং হরিসিং নমওয়ার অধীন শিখ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা। - হান্টার

বাইরে চলে যায়। তার নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল হিন্দুস্তানী ধর্মান্ধ মুসলমান আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সেই সব মুসলমানদের নিয়ে, যারা সুদিনে, দুর্দিনে, সর্বদা আপন ভাগ্য গ্রথিত করেছিল নেতার ভাগ্যের সঙ্গে এবং যাদের পক্ষে অসম্ভব তাকে ত্যাগ করা। অবশ্য সীমান্তের বহু সংখ্যক পাঠান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার ফলে এই বাহিনীর কলেবর স্ফীত হয়। পাঠানরা একদিকে যেমন ছিল শৌর্যশালী, অপরদিকে তেমনি তাদের ছিল পার্বত্য জাতিসুলভ অহঙ্কার এবং ধনলিপ্সা। একবার যুদ্ধের প্রাক্কালে[134] সীমান্তবাসী উপজাতীয়দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপজাতি দলত্যাগ করেছিল। পরবর্তীকালে ধর্মান্ধরা তাদের উপর কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ধর্মীয় নেতা তার হিন্দুস্তানী অনুগামীদের উপর সর্বদা নির্ভর করতে পারত। ফলে সে তাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করে। প্রথমে সে তার হিন্দুস্তানী অনুগামীবৃন্দের ভরণপোষণের জন্য কেবল সীমান্তবাসী অনুগামীদের উপর “ তিথ ” কর প্রয়োগ করে । সীমান্তবাসীরা ধর্মীয় কার্যে চাঁদা হিসেবে নির্বিবাদে এই করভার বহন করে । কিন্তু পরে এই করভারে জর্জরিত উভয় পক্ষ উষ্মান্বিত হয়ে উঠলে ধর্মীয় নেতা বেকায়দায় পড়ে যায়। সৈয়দ আহমদের প্রতিভা ছিল ধর্মান্ধ গৃহদাহকারীর প্রতিভা, সম্মিলিত রাজ্যের নিরপেক্ষ শাসনকর্তার প্রতিভা নয়। সুতরাং সীমান্তের উপজাতীয়দের উপর তার যে আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল, অনতিকাল পরই তা বিনষ্ট হতে শুরু করে ।

ক্ষমতায় যতই ভাটা পড়তে থাকে, ক্রমান্বয়ে ততই তার কঠোরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে পার্বত্য জাতির হৃদয়ের কোমলতম তন্ত্রীতে একদিন সে আঘাত করে। পার্বত্য

[134] সাইদুর নিকটবর্তী স্থানে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে যারাকজাই উপজাতীয়রা দল ত্যাগ করেছিল। - হান্টার

উপজাতিদের প্রচলিত বিবাহ প্রথা অনুসারে তারা বিবাহের নামে কার্যত সর্বোচ্চ পণদানকারীর কাছে মেয়ে বিক্রি করত। সৈয়দ আহমদের দুর্বুদ্ধি হল এই বিবাহ প্রথার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করার। তার ভারতীয় অনুগামী দল নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করে তার সঙ্গে চলে এসেছিল এবং স্ত্রীরাও তাদের সঙ্গে ছিল না। নেতা ফরমান জারি করল যে, সেইদিন থেকে বারোদিনের মধ্যে কোন উপজাতীয় মেয়ের বিবাহ না হলে সেই মেয়ে তার (নেতার) অনুচরদের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এর ফলে উপজাতীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে তার হিন্দুস্তানী অনুচরবর্গকে হত্যা করে। নেতার প্রাণ রক্ষা পায় অতি অল্পের জন্য।[135] কিন্তু তার রাজত্বের অবসান ঘটে । ১৮৩১ সালে ধর্মীয় নেতা তার একজন প্রাক্তন অনুচরকে সাহায্য করার সময় রাজপুত্র শের সিংহের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর দ্বারা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে নিহত হয় [136]। [137]

হান্টারের বর্ণনায় সিরাতে মুস্তাকিম প্রসঙ্গ

“অবশ্য মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ তার মতবাদ সুনির্দৃষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছিল বলে মনে হয় না। ধর্মীয় সংস্কার সাধন সম্পর্কিত তার চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক। শ্রোতাদের সে বলত যে, আল্লাহর ক্রোধ থেকে রেহাই পেতে হলে অবশ্যই সুন্দর জীবন যাপন করতে হবে। তার অন্যতম শিষ্য তার বক্তব্যসমূহ সংকলিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছে। তার সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা এই গ্রন্থটি

[135] পাঞ্জতার থেকে পাকলী উপত্যকায় পলায়ন। - হান্টার

[১৩৬] বালাকোট, মে. ১৮৪১ খ্রী. ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দফতর থেকে সংগৃহীত। - হান্টার।

[১৩৭] দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, বাংলা, অনুবাদ এম. আনিসুজ্জামান. খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা। পৃষ্ঠা ১-৯

কুরআনের মত[138] অনুসরণ করে। লেখক এই গ্রন্থে তার গুরুর সংক্ষিপ্ত বাণীসমূহকে নিজের ভক্তি-মিশ্রণে সম্প্রসারিত করে লিখেছে বলে মনে করা হয়। এই সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবের অনুশাসনসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারিক নৈতিকতা ভিত্তিক বলে প্রতীয়মান হয়। যে সকল সনদবলে সে পাটনায় তার খলীফাদিগকে নিয়োগ করেছিল, সেগুলোতেও দৈনন্দিন জীবন-ধর্মের মূলভাব সুস্পষ্ট। তার মতবাদের একমাত্র বিষয় ছিল এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং মানুষের প্রবর্তিত আচার ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে সরাসরি উপাসনা।[139]

মৌলবি আহমাদ রেযা খানের নবী তত্ত্বের সূত্র

বেরলভী সর্বোচ্চ ইমাম, নবী-রাসূলের উর্ধে যাকে তারা মর্যাদা দেয়, মৌলবি আহমাদ রেযা খান সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র শানে জঘন্য কটূক্তি করেন তার কিতাব ফতোয়া রেজভিয়া ১৫ তম খণ্ডে "*আল-কাউকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ ফী কুফরিয়্যাতি আবিল ওয়াহাবিয়্যাহ*" নামক রিসালায় ইসমাইল দেহলভীর কুফরিয়াত আলোচনায় ২৪ নাম্বার কুফুরির আলোচনার অধীনে এক জায়গায় তিনি বলেন

غالبا اصل مقصود اپنے پیر رائے بریلی سید احمد کو کہ نواب امیر خاں کے یہاں سواروں میں نوکر اور بچارے نرے سادہ لوح تھے نبی بنایا تھا

১৩৮ অতি সংগোপনে বিষ ডেলিভারী দিয়ে দিলেন মিস্টার হান্টার। বালাকোটিদের ঘরে ঘরে পবিত্র কুরআন শরীফ আছে, কতজন বালাকোটির ঘরে সিরাতে মুস্তাকিম আছে? প্রায় ২০ বছর আগে একটি সিরাতে মুস্তাকিম কিনেছিলাম গতকাল খুলে দেখি এটা অন্য সিরাতের মুস্তাকিম, পুরা নাম ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকিম!! - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

১৩৯ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪১ – ৪২।

"সাইয়িদ আহমাদকে নবী বানানো হয়েছিল"। (ফতোয়ায়ে রেজভিয়া, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৯৪, আলা হযরত নেটোয়ার্ক। ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫ দাওয়াতে ইসলামী)

যদিও বেরলভীরা তাদের ইমামের এই বক্তব্যকে জোরেশোরেই প্রত্যাখ্যান করে। তারা সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে ওয়াহাবীবাদের আমদানীকারক প্রমাণ করতে পারলেই খুশী।

মৌলভী আহমাদ রেযা খানের নবী তত্ত্বের সূত্র আমার তালাশে মিস্টার হান্টার। মি. হান্টার সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে পয়গম্বর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তার বইতে। হান্টার বলেন,

"আমাদের শৈথিল্যের জন্যই আমাদের মুসলমান প্রজাবৃন্দ প্রতিবেশী শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধদের দলে যোগদান করতে পারত। এই শৈথিল্যের জন্য আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে। পয়গম্বর (Prophet)[140] আমাদের ভুখণ্ডে এবং শিখ সীমান্তে তার ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল।"[141]

হান্টারের জবানীতে ওহাবী কারা

হান্টার বলেন, "They refuse divine attributes to Muhammad, forbid prayers in his name, and denounce supplications to departed saints."[142]

১৪০ Prophet কথাটি দ্বারা আমি অবশ্যই সৈয়দ আহমদকে বুঝিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহমদ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ওলি, মুহাম্মাদ (দঃ) এর পর আর কেউ পয়গম্বর (Prophet) হননি। - হান্টার।

১৪১ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১ – ১২।

- W.W. Hunter. The Indian Musalmans, P 20 – 21. 1872.

142 W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, London: Trubner and Company, 1872, p. 60

"আনুষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব অনুসারে ওয়াহাবীরা হচ্ছে যথার্থ একেশ্বরবাদী মুসলমান। তারা মুহাম্মাদ (দঃ) কেও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকার করে না, এবং তার নামে নামাজ পড়তে নিষেধ করে। পরলোকগত সাধুপুরুষদের নামে দোয়া দরুদ পাঠ করতেও বারণ করে তারা।"[143]

সাইয়িদ আহমদ শহীদ: হান্টারের বয়ানে যেভাবে ওহাবী হলেন

মিস্টার হান্টার খান বলেন,

"He returned to India no longer a religious visionary and reformer of idolatrous abuses, but a fanatical disciple of Abd-ul- Wahhab."[144]

'তিনি ভারতে ফিরে আসলেন। তবে এবার আর নিছক ধর্মীয় স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে আর কুপ্রথার সংস্কারক হিসেবে নয়, বরং আব্দুল ওয়াহাবের ধর্মান্ধ সাগরেদ হিসেবেই তিনি ভারতে ফিরে আসেন'।[145]

"ধর্মীয় নেতার ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা সফরের পর অনাড়ম্বর নিষ্ঠাবান জীবনযাপনের নীতিমালা নিরূপিত ও প্রচারিত হয়। সফরকালে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, পবিত্র নগরীতে মরুভূমির জনৈক বেদুঈনের প্রচেষ্টায় ব্যাপক "সংস্কার" প্রবর্তিত হয়েছে। তার নিজের চিন্তাধারার সঙ্গে এ সংস্কারনীতির মিল ছিল।[146] এ সংস্কারের প্রবর্তক পশ্চিম এশিয়ায় এক বিশাল ধর্মীয় সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতে সৈয়দ আহমদ ঠিক একই রকম সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা

[143] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৭

[144] W.W. Hunter. *Ibid,* p. 61

[145] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৮

[146] ভুয়া ও স্ববিরোধী তথ্য। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

পোষণ করত। সুতরাং তার ধর্মমত সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে আরবে ওহাবী সম্প্রদায়ের উত্থান ও অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন"।[147]

হান্টারের স্ববিরোধীতা:

প্রমাণিত হল মিস্টার খান অংকে খুব কাঁচা। বেচারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু কাঁচা থাকার কারণে নিজের জালে নিজে বন্দী হল। যেমন ইয়াযীদি জনৈক মুল্লা ইয়াযীদ বন্দনায় জুমার দিন, জুমার মিম্বরে, জুমার খুতবায় বলে দিল, ইয়াযীদ তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত করে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে ইমাম হুসাইনকে হত্যার দায়ে ফাঁসি দিয়েছিল!!! অথচ ইয়াযীদের মৃত্যুর ৩ বছর পর ইবনে যিয়াদকে মানুষ হত্যা করেছিল। আরেক ইয়াযীদী মুল্লা এমন বয়ান দিল যে, ইয়াযীদকে তার জন্মের ২ বছর আগে বানিয়ে দিল সেনাপতি।!!!

হান্টার মুল্লাও একইভাবে ধরা খেল। আসুন দেখা যাক:

হান্টার বললেন, সাইয়িদ আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)'র জন্ম ১৭৮৬ সালে। আবার বললেন ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের মৃত্যু ১৭৮৭ সালে। আবার বললেন "আব্দুল ওয়াহাবের[148] ধর্মান্ধ সাগরেদ হিসেবেই তিনি ভারতে ফিরে আসেন"[149] হান্টার আবার বললেন, ধর্মীয় নেতার ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা সফর করেন এবং জনৈক বেদুইনের[150] সংস্কার দেখে অনুপ্রাণিত হোন। আরো কোন হান্টারী বলেন, শায়খ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের সাথে দেখা হয়নি তবে উনার শিষ্যদের সাথে দেখা হয়েছে। কোন হিসাবই মিষ্টার খান মিলাতে পারলেন না। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, "১৮১৩ থেকে

[147] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৩

[148] শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব উদ্দেশ্য। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

[149] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৮

[150] শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব উদ্দেশ্য। - হুদা

১৮৩০ সাল পর্যন্ত মক্কায় ওয়াহাবীরা জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে রাস্তায় বের হতে পারেনি । এমনকি আজও অসম্মান ও মারপিটের আশংকা ছাড়া তারা পথে চলাফেরা করতে পারে না।[151]

"হযরত সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ এবং তার সাথীরা হজ্জ শেষ করেন ১২৩৭ হিজরিতে, এই সময় মক্কা মুকাররামায় নজদীদের নাম নিশানাও ছিল না। বরং মক্কা মুকাররামা'র শাসকেরা নজদীদের সাথে সামান্য জানাজানির সন্দেহ হলে ঐসব হাজীদেরকে খুব কষ্ট দিত। সুতরাং নজদী ওয়াহাবীদের সাথে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র দেখা-সাক্ষাত এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার কাহিনী সত্যের অপলাপ নয় তো আর কি?"[152]

হান্টারের বুকে আঘাত: হান্টারীদের কপালে হাত

একথা এখন আর অজানা নয় যে, সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে ওহাবী এবং জেহাদ আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বানিয়ে প্রচারে কিছু দেশী-বিদেশী লেখককে ব্যবহার করা ছিল দখলদার বৃটিশের একটি ষড়যন্ত্র। মিঃ হান্টার এই দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেছিল। পরবর্তীতে যারাই সাইয়িদ আহমদ শহীদকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করেছে বা এখনো করছে তারা সবাই মূলতঃ মি: হান্টারের শিষ্য।

হান্টার বলেন:

"সর্বশেষ মিশরের মুহাম্মাদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন। ১৮১২ সালে পাশার পুত্রের অধীনস্ত সেনানায়ক টমাস কীথ গোলার মুখে মদিনা দখল করলে । ১৮১৩ সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হল । আর পাঁচ বছর

[151] ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২
[152] মাসঊদ আলম নদভী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০-২১

পরে অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড়ে বিলীন হয়ে যাবার মত কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল ।[153]"

সাইয়িদ সাহেবকে কেন ওহাবী বানাতে হবে?

দখলদার বৃটিশের পরিকল্পনায় সাইয়িদ সাহেব এবং জেহাদীদেরকে ওহাবী বানালো হল, কারণ মুজাহিদ বাহিনীকে রুখতে হলে একমাত্র পথ হল জাতির কাছে তাদেরকে কলঙ্কিত হিসেবে প্রমাণ করা। হান্টার প্রমুখদের মাধ্যমে তারা এই কাজটি করেছিল, কিছু মুনাফিক মুল্লাও বৃটিশের খেদমতে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করেছিল। হাজারো, লাখো আলেম-উলামা ও সাধারণ মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে বৃটিশ বিতাড়িত হল ঠিক, সমস্যায় পড়ল তাদের ভারতীয় এজেন্ট ও মিত্ররা। বিশেষ করে মিত্রশক্তির এক শ্রেণীর মুল্লাগোষ্ঠী। যা কিছু অর্জন, যা সম্মান, জাতির জন্য যত ত্যাগ সব বিপ্লবী ভারতবাসীর। এই বেইজ্জতী থেকে বাঁচার জন্য সেই পুরাতন ফর্মুলা "ওরা ওহাবী"। মিত্রশক্তি বলে পরিচিত ঐ সব "বৃটিশ প্রজা" মুল্লাগোষ্ঠী যে গোমরাহ তার বাস্তব প্রমাণ হল আজো যদি আপনি ভন্ডামী, গোমরাহির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন তারা আপনাকেও ঐ একই উপাধি দিবে "ওহাবী"। যদিও বা আপনি তাদের সতীর্থ হোন। বিগত কয়েক বছরে তাদের কত সতীর্থকে তারা ওহাবী ফতোয়া দিয়েছে, তার হিসাব আমাদের কম-বেশী জানা আছে।

ওহাবী প্রবক্তাদের প্রকারভেদ:

১. সাইয়িদ সাহেবকে ওহাবী না বানালে যাদের ইজ্জত বাঁচে না

কিছু লোক আছে, তারা মনে করে সাইয়িদ সাহেবের আলোচনা করলে তাঁদের হযরতের অপমান হয়। জনৈক মুফতির বক্তব্য উদ্ধৃত করছি,

[153] W. W. Hunter, *Ibid*, p. 59. – হান্টার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৭

“যারা সাইয়িদ আহমাদ রায়বেরেলি সাহেবকে মুজাদ্দিদ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক, খাঁটি সুন্নী হানাফী, বলেন, তাঁরা প্রকারান্তরে মাওলানা আহমাদ রেযা খানের বিরুদ্ধে এক ধরনের কুৎসা প্রপাগান্ডা চালাচ্ছেন।”

২. যাদের কাছে ওহাবী গায়রে ওহাবী উভয় সমান

কিছু লোক আছেন তাঁদের কাছে ওহাবী গায়রে ওহাবী উভয় সমান, সকলেই ইতিহাসের অংশ। তাঁদের কাছে কে ওহাবী আর কে নয় তা থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কে স্বাধীনতার পক্ষে।

৩. ইসলামী আন্দোলন বিদ্বেষী লেখক

ওরা সকলেরই বিরুদ্ধে, মুসলমানদের মধ্যে যাতে ঐক্য না হয় এই হচ্ছে তাদের মিশন।

৪. অজ্ঞতা

ওরা আসলে জানে না আসল সত্য। যে কারো লেখাকে যাচাই বাছাই না করে কপি করে। নোট গাইড যারা লেখে তাদের মধ্যে এই গ্রুপটি বেশী।

৫. সালাফী

ওরাই ভারতে আসল ওয়াহাবী। ওরা এখন তাদের কলঙ্ক মুছে ইতিহাসের অংশ হতে চায়।

৬. বেদাতী

নানান বেদাতকে ওরা দ্বীন হিসাবে পালন করে। তাদের মধ্যে বানোয়াট আকীদা, বানোয়াট ইবাদাতের সয়লাব। ওরা সাইয়িদ সাহেবেকে ওহাবী বলে। কারণ তিনি তাদের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। আজকের দুনিয়াতেও আপনি যদি ভন্ডামী, বানোয়াটির বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা আপনাকেও ওহাবী

বলবে। সতীর্থ হলেও তারা খাতির করে না। নাম বলতে পারবো কয়েকজনের, বলবো না।

নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ কার খলীফা?

মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় লেখেন,

“শাহ আল্লামা সুফী নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সরাসরি শাহ আব্দুল আজীজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুরীদ ও খলীফা। তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুরীদও নন, খলীফাও নন। যেহেতু নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেরলভীর হাতে বায়আতে জিহাদ[154] করেছিলেন বায়আতে তরিকত নয়। এ তথ্য আল্লামা[155] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী ‘ওহাবী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনায় “নজদী পরিচয়” শিরোনামাঙ্কিত পুস্তকে ১০৯, ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। সিরাজ নগর দরবার শরীফের পীর সাহেব আল্লামা আব্দুল করীম[156] মাদ্দাজিল্লুহুল আলী এটা ভিডিও

[154] তাহলে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র জিহাদ আন্দোলনের কথা স্বীকার করলেন!!!

[155] ডাল মে কুচ কালা হ্যায় অথবা কালা মে কুচ ডাল হ্যায়। রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদীকে সিরাজ নগরের গালীবাজ পীর ফুরফুরাবী বলে পরিচয় দিয়েছেন, আবার এখানে মৌলবি আশরাফুজ্জামান উনার নামের শুরুতে আল্লামা ব্যবহার করলেন!! উনি ফুরফুরাবি তাই দলীল বিহীন কথা যদি দলীল হয়ে যায়, খোদ ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে জামানের কথা কেন দলীল হয় না। রিদওয়ানুল হক যে রেজভী বা বেরলভী ঘরানার, তা কিন্তু আর অজানা নয়।

[156] সিরাজনগরী সাহেব তো তার ভিডিওতে শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভীকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলেছেন। অথচ মৌলবি আশরাফুজ্জামান শাহ আব্দুল আজীজ র. কে ওহাবী প্রমাণ করেছেন।

আকারে প্রকাশ করার পরেও আপনারা ‘সামি’না ওয়া আসাইনা’ অর্থাত না-মানার কসম করে বসে আছেন’।

সিরাজ নগরের গালিবাজ মুরব্বী মৌলবি আব্দুল করীম সাহেবের ভিডিও দেখে আমি জবাব দিয়েছি বহু আগে। বেরলভী লেখক ও তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপদেষ্টা[157] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী সাহেবের ‘নজদী পরিচয়’ বইটি আমাদের দেখা আছে। কোনো রেফারেন্স ছাড়া মনগড়া কিছু কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন,

‘শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী সাহেব, তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে তরীকতের খেলাফত দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, পরে আবার রহিত করে দেন। কারণ শাহ আব্দুল আজীজের জীবদ্দশায় তরীকতহীন বেরলভী সাহেবই ইসমাইল দেহলভী নামীয় খারিজী আকীদাপন্থীকে মুরিদ করেন। এবং সৈয়দ সাহেব স্বয়ং ইসমাইল দেহলভীর সহায়তায় খোদার হাতে মুরীদ হয়েছিলেন। শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী[158] রাহিমাহিল্লাহ লক্ষ্য করলেন যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে যদি খলীফা নিযুক্ত করা হয় তবে আহলে সুন্নাতের তরীকত ও খেলাফত খারেজী খেলাফতের শামিল হয়ে যাবে। তখন তিনি বেরলভীর খেলাফতকে কেটে সেই তরীকতের খেলাফতকে দিল্লী হতে বঙ্গ-ভারত মুখী করে দেন। অর্থাৎ সূফী নূর মুহাম্মাদ রহ. কে শাহ আব্দুল আজীজ রহ. এর পীরানে তরীকতের স্থলাভিষিক্ত

[১৫৭] দেখুন ইসলামাবাদী সাহেবের লেখা ‘ওহাবী পরিচয়’ বইয়ের ১ম পৃষ্ঠা। প্রকাশনায় রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, বাংলা বাজার ঢাকা।

[158] বেরলভীদের বিশ্বাস শাহ আব্দুল আজীজ নিজেই ওহাবী, যা ইতিপূর্বে এই বইতে দেখানো হয়েছে। খোদ আশরাফুজ্জামান তার বইতে প্রমাণ দিয়েছেন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আব্দুল আজীজ ওয়াহাবী। অবশ্য সুন্নীরা তাঁদের উভয়কে এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদকে সুন্নী হিসাবেই জানে ও মানে।

করেন। এই অভিমত ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রাসুল মেহেরের।[159]

গোলাম রাসূল মেহের –

১. তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ ২. জামাআতে মুজাহিদীন

ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম রাসূল মেহের সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং তার সাথী-খুলাফাদেরকে নিয়ে একাধিক বই রচনা করেছেন।

তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ এবং *জামাআতে মুজাহিদীন* বইতে তিনি সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র সাথী ও খলীফা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[160]

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী

কারোয়ানে ঈমান ও আজীমত

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ’র খলীফা হিসাবে স্পষ্ট শব্দে উল্লেখ করেছেন ভারত উপমহাদেশের অন্যতম মুসলিম মনীষী, লেখক ও

[159] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, *নজদী পরিচয়*, ঢাকা: রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯০ পৃ. ১১০

-গোলাম রাসুল মেহের সম্পর্কে মিথ্যাচার করা হয়েছে। একটু পরই এই বিষয় ক্লিয়ার করা হবে ইনশাআল্লাহ। - মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

[160] ক. গোলাম রাসূল মেহের, *তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ*, মুযাফফরনগর: ইমরান কম্পিউটার্স, ২০০৮, খ. ৩, পৃ. ৩৪৭ ; খ. গোলাম রাসূল মেহের, *জামাআতে মুজাহিদীন*, লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, তাবি, পৃ. ২৬৮।

গবেষক, বিশ্বমুসলিমের কাছে একটি অত্যন্ত নন্দিত নাম, সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক কিতাব রচনাকারী সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ।
সাইয়িদ আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কারওয়ানে ও আজীমত গ্রন্থে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখেন,

صوفی نور محمدؒ

آپ بنگال میں سید صاحبؒ کے خلفاء کبار میں سے تھے، جہاد میں سید صاحبؒ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے جہاد میں زخمی ہوئے، ہندوستان واپس آئے اور تبلیغ و ارشاد کے کام میں مصروف ہو گئے، آپ سے بڑا فیض پہنچا، آپ کا سلسلہ بہت وسیع ہے جس میں بڑے بڑے مشائخ اور اہلِ کمال پیدا ہوئے۔ آپ کے سلسلہ میں صوفی فتح علی، مولانا غلام سلمانی، مولانا ابوبکرؒ، مولانا سید عبدالباری حسنیؒ صاحبِ ارشاد اور صاحبِ سلسلہ بزرگ گزرے ہیں، اس کتاب میں صوفی صاحبؒ کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ آپ کی قبر میر سرائے سے ۵ میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ (از افادات مولوی محمد سعید صاحب اعظمی)

'আপ বাংগাল মে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহকে খুলাফায়ে কিবার মে ছে থে, জেহাদ মে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ কে ছাথ তাশরীফ লে গায়ে থে, জেহাদ মে জখমী হুয়ে, হিন্দুস্তান ওয়াপস আয়ে আওর তাবলীগ ও ইরশাদ কে কাম মে মছরুফ হো গায়ে, আপ ছে বড়া ফয়েজ পৌচাঁ, আপ কা সিলসিলাহ বহুত ওছী' হায়, জিছ মে বড়ে বড়ে মাশাইখ আওর আহলে কামাল পয়দা হুয়ে, আপ কে সিলসিলা মে সূফী ফতেহ আলী, মাওলানা গোলাম সালমানী, মাওলানা আবূ বকর, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল বারী হাসানী ছাহেবে ইরশাদ আওর ছাহেবে সিলসিলা বুজুর্গ গুজরে হ্যেঁ, ইছ কিতাব মে সূফী ছাহেব কা জিকির মুতাআদ্দিদ বার আয়া হায়, আপ কি কবর মীর সরাই ছে পাঁচ মিল মাগরিব কি তারাফ ওয়াক্কে' হায়।'
অর্থাৎ তিনি বাংলায় সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র অন্যতম একজন খলীফা ছিলেন, জেহাদে সাইয়িদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র সাথে তশরিফ নিয়েছিলেন, জেহাদের ময়দানে আহত হয়ে গিয়েছিলেন, হিন্দুস্তান ফিরে আসেন এবং তাবলীগ ও ইরশাদের

কাজে মশগুল হয়ে যান। তাঁর থেকে অনেক ফয়েজ পৌঁছেছে, উনার সিলসিলা অনেক প্রশস্ত, যে সিলসিলায় বড় বড় মাশায়েখ এবং কামিল বুজুর্গ পয়দা হয়েছেন। তাঁর সিলসিলায় সূফী ফতেহ আলী, মাওলানা গোলাম সালমানী, মাওলানা আবূ বকর, মাওলানা সাইয়িদ আব্দুল বারী হাসানী প্রমুখ সাহেবে ইরশাদ আওর সাহেবে সিলসিলা বুজুর্গ গত হয়েছেন। এই কিতাবে বারবার তাঁর আলোচনা এসেছে। তাঁর কবর মিরসরাই থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।[161]

Shabnam Begum: BENGAL'S CONTRIBUTION TO ISLAMIC STUDIES DURING THE 18TH CENTURY

One night Prophet Muhammad(peace be upon him) appeared in his dream and instructed him to become murid of Syed Ahmed Barelvi (1786-1831) Next morning he immediately carried out the instruction of the prophet. At that time Barelvi was engaged in a movement to bring back self-confidence and spirit of freedom in the Muslims and Hazrat Nizampuri took active part in this movement and even participated in the battle of Balacot.[162]

১৮শ শতকে ইসলাম শিক্ষায় বাংলার অবদান

এক রাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর(১৭৮৬-১৮৩১)

---

[161] সাইয়িদ আবূল হাসান আলী নদভী, *কারোয়ানে ঈমান ও আজীমত*, লাহোর: সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমি, ১৯৮০, পৃ. ১২৫

[162] Shabnam Begum, *Bengal's Contribution to Islamic Studies During the 18th Century*, PhD Thesis, Department of Islamic Studies, Aligarh muslim university, Aligarh, India, 1994. P. 75–76

মুরিদ হওয়ার নির্দেশ দেন। পরদিন সকালে তিনি অবিলম্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করেন। সেই সময়ে সৈয়দ বেরেলভী মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতার চেতনা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এক আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন। হযরত নিজামপুরী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এমনকি বালাকোটের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

আবূ জাফর ফুরফুরাবী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী: ওয়াজাইফে তরীকত

ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা আবূ বকর সিদ্দীকী রাহিমাহুল্লাহ'র সাহেবজাদা আবূ জাফর সিদ্দীকী তাঁর ওজাইফে তরীকত নামক কিতাবে তাঁর শাজরাহ উল্লেখ করেছেন।

শাজরায় দেখা যাচ্ছে ,

১. তাঁর শায়খ তাঁর ওয়ালিদ মুজাদ্দিদে মিল্লাত, ইমামুশ শরীয়ত ওয়াত ত্বরীকত, ইমামুল হুদা, আলহাজ্ব আবূ বকর সিদ্দীকী কুরাইশী, ২. তাঁর মুর্শিদ হযরত আরিফ বিল্লাহ, আশিকে রাসূল, কুতবুল ইরশাদ মাওলানা সাইয়িদ ফতেহ আলী সাহেব মুর্শিদাবাদী,

৩. তাঁর মুর্শিদ মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপূরী,

৪. তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ সাইয়িদ আহমাদ বেরেলী,

৫. তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ,

৬. তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী।[163]

[163] আবূ জাফর ফুরফুরাবী, ওয়াজাইফে তরীকত, ভারত: ফুরফুরা শরিফ, পৃ. ৯

সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী ফুরফুরাবী তরীকতে তাসাউফ

ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামানের নাতি মাওলানা সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকীর শাজরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী

২. তাঁর পীর মাওলানা মুহাম্মাদ নাজমুস সাআদাত সিদ্দীকী

৩. তাঁর পীর মুজাদ্দিদে জামান আলহাজ্ব আবূ বকর সিদ্দীকী কুরাইশী

৪. তাঁর পীর হযরত মাওলানা সাইয়িদ ফতেহ আলী উয়াইসী

৫. তাঁর পীর সূফী গাজী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী

৬. তাঁর পীর মাওলানা শাহ সাইয়িদ আহমাদ বেরলভী।[164]

শাহ সূফী সাইয়িদ আহমাদুল্লাহঃ আজিমপুর দায়রা শরীফ

আজিমপুর দায়রা শরীফ নামক বইতে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

'হযরত নেযামপুরী র. যখন দায়রা শরীফে আসিয়া পৌঁছেন, তৎকালে দায়রা শরীফে গদ্দীনশীন ছিলেন হযরত শাহ সুফী সাইয়িদ দায়েম র. এর কনিষ্ঠ সাহেবজাদা হাজীউল হারামাইন হযরত মাওলানা শাহ সূফী সাইয়িদ লাক্বীতুল্লাহ রহ.। হযরত নেযামপুরী রহ. কিছুদিন দায়রা শরীফে অবস্থানের পর গদ্দীনশীন হযরতের খেদমতে বাইয়াত হইয়া তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন।[165]

একই বইতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে,

[164] সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী, তরীকতে তাসাউফ, ভারত: ফুরফুরা শরিফ, পৃ. ৩৭

[165] শাহ সূফী সাইয়িদ আহমাদুল্লাহ, *আজিমপুর দায়রা শরীফ*, ঢাকা: আজিমপুর দায়রা শরিফ, পৃ. ১৪৬

'দায়রা শরীফে মুরীদ হইয়াছিলেন এবং তথা হইতেই সূফী খেতাব লাভ করেন। কিন্তু সাইয়িদ আহমদ র. এর নিকট হইতে নকশেবান্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, চিশতীয়া ও কাদেরীয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন'।[166]

হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি ও সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী

হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি রাহিমাহুল্লাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা বলে উল্লেখ করেছেন। রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী সাহেব তার 'নজদী পরিচয়' বেইয়ের **১১২** পৃষ্ঠায় 'বঙ্গ-ভারতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রহ'র কতিপয় প্রসিদ্ধ মুরীদানের সংক্ষিপ্ত তালিকা'' শিরোনামে **১**ম নাম লেখেন এভাবে,

'**১**. মাওলানা রুহুল আমিন রহ. ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা, যার **১৮** হাজার হাদীস কন্ঠস্থ ছিল।'[167]

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী

মাওলানা রুহল আমিন রহ'র লেখা একটি বই 'ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী'। এই বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রহ. সম্পর্কে লেখেন,

[১৬৬] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৪৮

[167] রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ.১১২

'**হযরত কুতবুল আক্তাব সূফী নুর মোহম্মদ ছাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়** ইনি চট্রগ্রামের নেজামপুরের মলিইয়াস গ্রামের বাসিন্দা। ইনি ঢাকা দায়রা শরীফের সূফী দায়েম সাহেবের নিকট কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকা শিক্ষা সমাপন করতঃ কামেল হইয়াছিলেন। পরপর তিনি তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিতেছেন, হে নূর মুহাম্মাদ! আমার পুত্র সৈয়দ আহমদ বেরলভী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ কর। ইহাতে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া হজরত মোজাদ্দেদ সাহেবের খেদমতে থাকিয়া অবশিষ্ট তকরিকাগুলিতে কামেল-মোকাম্মেল হইয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার সঙ্গে জেহাদে যোগদান করতঃ গাজী হইয়াছিলেন'।[168]

কারামাতে আহমাদিয়াঃ হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহল আমীন বশিরহাটি

হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহল আমীন বশিরহাটি রাহিমাহুল্লাহ'র আরেকটি বই কারামাতে আহমাদিয়া। এই বইয়ের ২৬ থেকে ২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র ৮০জন অন্যতম খলীফার নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৬১ নাম্বার খলীফার নাম সূফী নূর মুহাম্মাদ সাহেব, নেযামপুর, চট্রগ্রাম।[169]

[168] হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহল আমীন বশিরহাটি, *ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী, বশিরহাট*: নবনূর প্রেস, ২০০৫, পৃ. ২২-২৩

[169] হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, *কারামাতে আহমাদিয়া বা একখানা বিজ্ঞাপন রদ, বশিরহাট*: নবনূর প্রেস, তাবি, পৃ. ২৬ -২৯

বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী: হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি

সূফী নূর মুহাম্মাদ চাটগামী সাহেব তথায় কামেল হইয়া যান, যে সময় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সা কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় হজরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর মুহাম্মাদ সাহেবকে স্বপ্নযোগে বলেন, হে নূর মুহাম্মাদ! আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তুমি তাহার সহিত সাক্ষাত কর। তিন বার হজরত এরূপ আদেশ করিলে, ইনি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া খেলাফত লাভ করেন এবং হযরত সৈয়দ সাহেবের শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার খেদমতে থাকেন। [170]

ইসলাম প্রসঙ্গ: ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইহ -পরকালের মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন হযরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ) । যদি বালাকোটের যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীর নিকট তার মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত না হইত, তবে আমরা একশত বৎসর পূর্বেই পাকিস্তান হাসিল করিতে পারিতাম। কিন্তু শহীদের খুন কখনও বৃথা যায় না। তাহার পরে তাঁর খলীফা মৌলানা কিরামত 'আলী জৌনপুরী, মৌলানা শাহ্ সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী প্রভৃতি বাংলাদেশ ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের নেতা পীর বীর শহীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইসলামের মৃতসঞ্জীবনী সুধাবাণী প্রচার করেন । মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী সাহেব

---

[১৭০] হাফিজুল হাদীস আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, *বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী*, বশিরহাট: নবনূর প্রেস, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০

১২৬৫ বাংলা সনে এন্তেকাল করেন । তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন হযরত মৌলানা শাহ্ সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব ।[171]

মীরসরাইয়ের সুফী-সাধক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব: মুহাম্মাদ সাইফুল হক্ব সিরাজী

এই বইতে উল্লেখিত শাজরাতেও দেখা যাচ্ছে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহ'র মুর্শিদ সাইয়িদ আহমাদ শাহীদ রাহিমাহুল্লাহ।[172]

আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহঃ চারি তরীকার শাজরা.

৩৬। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহঃ জন্ম ১১৫৯ হিজরী) । তিনিও পিতার নিকট সর্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মুহাদ্দিছ নামে খ্যাত হন । হাদীছ ও তাফসীরের বহু কেতাব প্রণয়ন করেন । ইনতেকাল ১২৩৯ হিজরী , ৭ ই শাওয়াল , মাজার দিল্লী ।

৩৭। হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরলবী (রহঃ) - পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপ করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ ই জমাদিউচ্ছানি তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন । ১২৪৬ হিজরী ২৪ শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন ।

৩৮। হযরত কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহ সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ) - চট্টগ্রামের নিজামপুর নিবাসী । স্বীয় পীর হযরত সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী (রহঃ) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন । প্রকাশ থাকে যে ,

---

[171] ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১, পৃ. ১০১

[172] মুহাম্মাদ সাইফুল হক্ব সিরাজী, *মীরসরাইয়ের সুফী-সাধক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব*

হযরত মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেব (রহঃ) উক্ত সাইয়েদ ছাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন । তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। জনাব সূফী ছাহেবের মাজার চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই থানার মলিয়াইস গ্রামে ।[173]

সীরাতে ওয়সী – মুহাম্মাদ মুবারক আলী রাহমানী

'হযরত সূফী সাহেব জাহেরী তালীম সমাপ্ত করে নকশাবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকায় কামিয়াবী হাসেল করতঃ এশায়াতে এসলামে যখন রত ছিলেন, সে সময় তিনি একদিন স্বপ্নযোগে হযরত রেসালাত মায়াব ছরকারে দো আলম হযরত নবী পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাশারাত হয় "আমার সন্তান সৈয়দ আহমদ কলিকাতা এসেছেন। তুমি যেয়ে তার হাতে বয়ত গ্রহণ কর'। [174]

অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক রাহিমাহুল্লাহ'র জীবন চরিত: সিদ্দিক আহমাদ খান

'শাজরা জৌনপুরী শাখা,

হাদীয়ে বাংলা ও আসাম পীরানে পীর হযরত শাহ সূফী মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মুজাহিদ-ই-আজম শহীদুল মিল্লাত হযরত শাহ সূফী সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলীফা এবং কুতুবুল আক্তাব হযরত মাওলানা শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের পীর ভাই'।[175]

---

[173] আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ, *চারি তরীকার শাজরা, আদাবে মুর্শিদ ও ওজীফা*, নেছারাবাদ: ছারছীনা দরবার শরীফ, পৃ. ৪৮

[174] মুহাম্মাদ মুবারক আলী রাহমানী, সীরাতে ওয়সী, পৃ.২১-২২

[175] সিদ্দিক আহমাদ খান, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক রাহিমাহুল্লাহ'র জীবন চরিত, পৃ. ৩৩১

কেন এই অপপ্রচার?

এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন সাইফুল্লাহ হানাফী তাঁর মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন বইতে।

'আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের মিথ্যাচার ও বেয়াদবি

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের বক্তব্য ও লেখনী মিথ্যাচার ও বেয়াদবিতে পরিপূর্ণ। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে তুলে ধরা হলো।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-কে নিয়ে অপপ্রচার

রেজাখনীদের অন্যতম জঘন্য অপপ্রচার হচ্ছে গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন। তারা তাদের স্বভাবসুলভ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জোরেশারে এ প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের প্রায় সকল সিলসিলা তথা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ সিলসিলা দু'জন মহান ব্যক্তির মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের একজন হলেন হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আর অপরজন হলেন গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী। এমতাবস্থায় রেজাখানীরা মহাবিপদে পড়েছে। নিজেদের মনগড়া ফতওয়ার ফলে তারা চলাফেরা ও উঠা-বসায় কারো সাথে যেতে পারছে না। বাংলাদেশে যেখানেই রুটি-রুজির ধান্দায় তারা বিচরণ করে, সেখানেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকার মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে নিজেদের রুটি-রুজির ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা বলতে শুরু করল নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ বেরলভী রে.) এর খলীফা নন। এখন আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী কার মুরীদ বা খলীফা ছিলেন? এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, ফুরফুরা, শর্ষিনা, হালিশহর, সোনাকান্দাসহ বাংলাদেশে বা এ উপমহাদেশে যারা সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর উত্তরসূরী রয়েছেন

তাদের সিলসিলার শাজরা এর মধ্যে গাজীয়ে বালাকোট নিজামপুরী রে.) এর মুরশিদ হিসেবে তারা কার নাম উল্লেখ করেছেন? এটা সুস্পষ্ট যে, সব সিলসিলার শাজরায় প্রত্যেকেই নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ হিসেবে হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর নাম উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য। প্রশ্ন হলো, যারা তার উত্তরসুরী তারা নিজেদের তরীকা সম্পর্কে বেশি জানেন, না রেজাখানীরা বেশি জানেন? আরবীতে প্রবাদ আছে, صَاحِبُ البَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِيْهِ "ঘরের মধ্যে কী আছে গৃহবাসীই বেশি জানেন' । সুতরাং নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ কে তা তার সিলসিলার অনুসারীগণ থেকে জেনে নিন। পাঠকগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত মশহুর হক দরবারগুলোর সিলসিলা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের যেখানেই হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর নাম এসেছে সেখানেই তার নামের সাথে "গাজীয়ে বালাকোট" বাক্যটি যুক্ত রয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? এ ব্যাপারে রেজাখানীরা কী বলবে? তৃতীয়ত : চট্রগ্রামের সীতাকুণ্ডে হযরত নিজামপুরী (র.) এর মাযারে প্রবেশ পথের গেইটে তার নামের সাথে এখনও লেখা আছে "গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)'।

রেজাখানীদের দাবি, হযরত সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন; আজিমপুর দায়রা শরীফের শাহ সুফী সায়্যিদ লাকীতুল্লাহ (র.) এর খলীফা। অথচ আজিমপুর দায়রা শরীফের মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদনশীন শাহ সুফী সায়্যিদ আহমাদুল্লাহ সাহেব এর লেখা দায়রা শরীফের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'আজিমপুর দায়রা শরীফ' এর মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সাথে জিহাদ ও তরীকতের দিক থেকে সূফী নুর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর সম্পর্ক ও খেলাফত লাভের বিবরণ রয়েছে। শুধু তাই নয়,

১২৪৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার পায়ে গুলিবিদ্ধ হবার বর্ণনাও এতে রয়েছে। (দেখুন আজিমপুর দায়রা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৪৭) বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দিবালোকের মত সুস্পষ্ট বিষয়ে এত জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচারণা চালাতে রেজাখানীরা একটুও দ্বিধাবোধ করল না। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে সত্য গোপন ও মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার।

মা থেকে মাসীর দরদ বেশী . বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে রেজাখানীরা প্রমাণ করতে চান যে, শর্ষিনা সিলসিলার অনুসারীগণ তরীকতের দিক থেকে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারী নন, অথচ অতীতে বা বর্তমানে শর্ষিনার পীর সাহেব (র.) এর অনুসারীগণ এমন কোনো দাবি করেছেন বলে কোনো প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি বা পারবেনও না। বরং শর্ষিনা দরবার শরীফ হতে নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার উর্ধ্বতন বুযুর্গদের মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)ও রয়েছেন। দেখুন উইলিয়াম হান্টারের পথ ধরে কিভাবে সিরাজনগরীরা ইতিহাস বিকৃত করে যাচ্ছেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে *চারি তরীকার শাজরা* কিতাবে লেখা হয়েছে- "হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) পাঞ্জাবের রাজা রনজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপে করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ই জমাদিউচ্ছানী তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ১২৪৬ হিজরীর ২৪ শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন। হজরত কুতবুল আকতাব মাওলানা শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.)- চট্টগ্রামের নিজামপুরবাসী। স্বীয় পীর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মাওলানা শাহ

কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব (র.) উক্ত সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন।[176] উল্লেখ্য যে, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর ওফাত ১৮৫৮ সনে আর আহমদ রেজাখানের জন্ম ১৮৫৬ সনে। এতে প্রমাণিত হয় আহমদ রেজা খানের জন্মের পূর্ব থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকতের খিদমত চালু ছিল।[177]

শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা হলেও তো ওহাবী!

মৌলবি আশরাফুজ্জামান এবং মৌলবি আব্দুল করীম সিরাজনগরীরা সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী রাহিমাহুল্লাহকে শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ'র খলীফা বানিয়ে মনে করেছিলেন যে, কেল্লা ফতেহ, রুটি রজীর ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু মৌলবি আশরাফুজ্জামান এতগুলি দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন খোদ শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ নিজেও ওহাবী। বেহায়াদের শিক্ষা হবে না। দেখুন মৌলবি আশরাফুজ্জামানের দলীল ১ ও ৬। তাছাড়া শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিমাহুল্লাহকেও ওহাবী প্রমাণ করেছেন মৌলবি আশরাফুজ্জামান। দেখুন তার দলীল ৩, ৭, ও ৮।

প্রমাণিত হল মৌলবি আহমাদ রেজা খানের অনুসারীরা শুধু গোস্তাখে রাসুল নয়, গোস্তাখে আউলিয়াও।

---

[176] আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৪

[177] সাইফুল্লাহ আল-হানাফী, *হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সহ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী **মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন**,* সিলেট: শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফাউন্ডেশন, ২০১৩, পৃ. ১৮৭–১৮৯

দিওয়ানে আজীজ প্রসঙ্গ

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের ২২ নাম্বার দলীল দিওয়ানে আজীজ। তার বয়ান 'ইমামে আহলে সুন্নাত, গাজীয়ে দ্বীন-মিল্লাত, মুজাহিদে আজম আশেকে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আযীযুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র রচিত ফার্সী কাব্য গ্রন্থ ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অনূদিত "দিওয়ানে আযীয' শরীফে মহান আল্লাহর হামদ ও রাসূলে কায়েনাত আলাইহি আফজলুচ্ছালাওয়াত ওয়া আতাম্মুত্তাসলিমাত ও বিভিন্ন আহকাম ও মাসায়েল- এর সমাধান সহ প্রায় ২৬২জন আউলিয়ায়ে কেরামের মানকাবাত লিখেছেন। এখানে মুর্শিদের বিবরণ শিরোনামে রয়েছে –'

মৌলবি দিওয়ানে আজীজের পেইজ দিয়ে লেখেন, 'দেখুন কত স্পষ্টভাবে দলীলসহ বলে দিয়েছেন, যে সিলসিলায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী রয়েছে সেটা রাসূলে পাক ﷺএর ফয়ূযাত ও বারাকাত থেকে বঞ্চিত ও কর্তিত, কারণ সে তো গোস্তাখে রাসূল ছিল।

এর উপর একজনের আপত্তি হল শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আল্লামা শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিযামপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং মাওলান শাহ্ আবু বকর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ দু'জনের প্রশংসা করেছেন। অতএব সিলসিলা কর্তিত কিভাবে হল?

এর জবাব হচ্ছে- প্রথমতঃ এ দু'জনের প্রশংসাকে সত্য এবং যথাযথ মানলে বেরলভী সাহেব সম্পর্কে যা বলেছেন তা মেনে নিচ্ছেন না কেন?

দ্বিতীয়ত, শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি ছিলেন ছাহেবে কাশফ ও কারামাত একজন আশেকে রাসূল

কামেল অলী। প্রশংসিত দু'জনের সিলসিলার হাক্বিকত সম্পর্কে নিঃসন্দেহে উনি জানতেন। ইসমাঈল দেহলভী ও "ছিরাতে মুস্তাকীম' এর প্রশংসায় যে ব্যক্তি পঞ্চমুখ কই তার প্রশংসা তো তিনি করেননি । অতএব "শেরে বাংলা পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এ ধরনের অপবাদ উনার বিরুদ্ধে অমূলক-অবাস্তর ও হাস্যকর'।[178]

সূফী নিযামপুরী এবং ফুরফুরার মুজাদ্দিদে যামানের শাজারা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। দুজনের শাজারাতেই সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র নাম আছে। এই দুই বুজুর্গের কথা বলে বেরলভী গোস্তাখে রাসূলদেরকে আর লজ্জা দিতে চাই না, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী যে ওহাবী একথা তো খোদ এই মৌলবি আশরাফুজ্জামান প্রমাণ করলেন। শেরে বাংলা সাহেব যেহেতু শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের ওয়াহাবিয়ত ধরতে পারলেন না, প্রমাণিত গোস্তাখে রাসূল মৌলবি রেযা খানের পক্ষাবলম্বন করার কারণে খোদ শেরে বাংলা সাহেব কি তাহলে রাসূলে পাক ﷺএর ফয়ূযাত ও বারাকাত থেকে বঞ্চিত ও কর্তিত? কারণ গোস্তাখে রাসূলের দালালী করে তিনিও গোস্তাখে রাসূল হয়ে গিয়েছিলেন। এটা সেই দিওয়ানে আজিজ, যেই দিওয়ানে রয়েছে বার্মার সুন্দরী নারীদের দৈহিক সৌন্দর্যের অশ্লীল বর্ণনা। দেখুন:

[178] আশরাফুজ্জামান আল কাদেরী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩

দিওয়ান-ই আযীয ॥ ৪৪০

رفتہ بودم ملک برما اے اخی | ملک برما نہ مگر ملک پری
রফ্‌তাহ্ বূ-দম মুলকে বরমা- আয় আখী- | মুলকে বরমা- নাহ্ মগর মুলকে পরী-

হে ভাই! আমি বার্মা সফরে গিয়েছিলাম।
বার্মা তো নয়, যেন পরীর দেশ।

صد ہزار آید نظر حور و پری | چوں عروس آراستہ دائم بنگری
সদ হাযা-র আ-য়দ নযর হূ-র ও পরী- | চূ-' 'আরূ-সে আ-রা-স্তাহ্ দা-ইম বেনগরী-

সেখানে যেন শত-সহস্র হূর-পরী দেখা যায়।
তাদেরকে তুমি দেখবে সবসময় দুলহানের মতো সজ্জিত।

می نمایند جلوہ او شاں آنچناں | مست و شیدا می شوند زاں عاقلاں
মী- নুমা-য়ান্দ জালওয়ায়ে উ- শা-ঁ আ-ঁচুনা-ঁ | মাসত ও শায়দা মী- শাওয়ান্দ যা-ঁ 'আ-কেলা-ঁ

তারা তাদের চমক এমনভাবে দেখায় যে,
তা দেখে বিবেকবানরা পর্যন্ত বিভোর ও আসক্ত হয়ে পড়ে।

خویشتن را می بیارایند چناں | می فریبند گر چہ باشند عارفاں
খে-শতন রা- মী- ব ইয়া-রা-য়ন্দ চুনা-ঁ | মী- ফরী-বন্দ গর চেহ্ বা-শন্দ 'আ-রেফা-ঁ

তারা নিজেদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করে যে, তাদেরকে দেখলে
অনেক লোক ধোঁকায় পতিত হয়, যদিও হয় তাঁরা আরিফবান্দা।

می فروشند حسن ہائے خویشتن | جان عاشق می خزند زاں یار من
মী- ফুরূ-শন্দ হুসন হা-য়ে- খে-শতন | জা-নে 'আ-শিক্ব মী- খযন্দ যা-ঁ ইয়া-রে মান

তারা নিজেদেরকে সৌন্দর্যকে বিক্রি করে,
যার কারণে প্রেমিকদের অন্তরকে আঁচড় দেয়- ওহে আমার বন্ধু!

چوں کمان حسن شان می افگند | جان عاشق را شکار شاں کنند
চূ-ঁ কামা-নে হুসনে শা-ঁ মী- আফগনন্দ | জা-নে 'আ-শিক্ব রা- শিকা-রে শা-ঁ কুনন্দ

যখন তাদের পূর্ণ সৌন্দর্যের জাল বিস্তার লাভ করে,
তখন তারা প্রেমিকের অন্তরকে তাদের শিকারে পরিণত করে।

عاشقاں را می کنند بیخانما | زندگی را شاں کنند یکسرفنا
'আ-শিক্বা-ঁ রা- মী কুনন্দ বে- খা-নমা- | যিন্দগী- রা- শা-ঁ কুনন্দ ইয়াকসার ফানা-

প্রেমিকদেরকে তারা ভবঘুরে করে ছেড়ে দেয়।
তারা তাদের জীবনকে নিঃশেষ করে ছাড়ে।

می ربا نید از قلوب عاشقاں | حبّ فرزند و زن شاں بکیساں

মী- রুবা- নে-দ আয কুলু-বে 'আ-শিক্বা-ঁ | হুব্বে ফরযান্দ ও যনে শা-ঁ বে-কসা-ঁ

তাদের প্রেমিকদের অন্তর থেকে হরণ করে নেয়
তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর ভালবাসাকেও।

آں چہ آید در نظراز حسن شاں | نیست ذاتی عارضی محض داں

আ-ঁ চেহ্ আ-য়দ দর নযর আয হুস্নে শা-ঁ | নী-স্ত যা-তী- 'আ-রেযীয়ে মহয দা-ঁ

তাদের যেই সৌন্দর্য নযরে আসে,
জেনে রেখো! ওটা কোন স্থায়ী কিছু নয়, বরং সাময়িক।

پوست ابیض بنی شاں راے جواں | نہ ملیحند نہ شکیلند بیگماں

পূ-স্ত আবয়াষ বী-নী- শা-ঁ রা- আয় জাওয়া-ঁ | নাহ্ মালী-হান্দ নাহ্ শাকী-লান্দ বে-গুমা-ঁ

ওহে যুবক! তাদের সাদা চামড়াটুকুই দেখতে পাবে।
কিন্তু নিঃসন্দেহে তাদের না আছে কোন লাবণ্য, না তারা সুশ্রী।

غازہ مالند دائما بر روئے شاں | بر ضفیرۃ گل بہندند دلستاں

গা-যাহ্ মা-লান্দ দা-ইমান বর রু-য়ে- শা-ঁ | বর যফী-রাহ্ গুল ব বন্দন্দ দিলসিতা-ঁ

তারা তাদের চেহারার উপর সবসময় প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে।
বিনির উপরও রমণীরা চিত্তাকর্ষক ফুল গেঁথে দেয়।

پس مشو غرّہ بریں حسن دروغ | دین و ایمان رامکن زاں بیفروغ

পস মাশ্- গোররাহ্ বরী-ঁ হুসনে দুরু-গ | দী-ন ও ঈ-মা-ন রা- মকুন যা-ঁ বে-ফুরু-গ

সুতরাং এসব মিথ্যা সৌন্দর্যের পেছনে পড়ে ধোঁকা খেয়ো না।
দ্বীন ও ঈমানকে এর মাধ্যমে বরবাদ করে দিওনা।

در ضفیر ہم نہند شانہ سفید | ہوش عقلا زاں ہمیں گردد فقید

দর যফী-র হাম নিহান্দ শা-নাহ্ সফায়দ | হো-শে 'ওক্বালা- যা-ঁ হামী-ঁ গরদদ ফাক্বী-দ

চুলের বিনীর নিম্নভাগে সাদা সাদা স্কন্ধগুলো রাখে (শোভা পায়)।
এটা দেখে বহু বিবেকবান মানুষকেও হুঁশহারা করে ছাড়ে।

کرتہ باریک و ابیض بر صدر | بانگار و نقش پوشند خوب تر

কোর্তায়ে বা-রী-ক ও আবয়ায বর সদর | বা-নেগা-র ও নক্বশ পূ-শন্দ খো-বতর

তারা বুকের উপর ফুলের কাজ ও নক্সাখচিত পাতলা ও
সাদা রঙের সুন্দর সুন্দর জামা-পোশাক পরিধান করে।

ہر یک از بہر شکار عاقلاں | بس کمند محکم آمد بیگماں

হার এক আয বাহরে শিকা-রে 'আ-ক্বেলা-ঁ | বস কমন্দে মুহকাম আ-মদ বে-গুমা-ঁ

প্রত্যেকেই বিবেকবানদের শিকার করার জন্য-
ব্যাস। মজবুত ফাঁদ হিসেবে (সামনে) আসে; তাতে সন্দেহ নেই।

حسن او شاں محض برآرایش ست | ایں سخن مرد زکی را باورست

হুসনে উ-শা-ঁ মহয বর আ-রা-ইশাস্ত | ঈ-ঁ সুখন মর্দে যকী- রা- বা-ওয়ারাস্ত

তাদের সৌন্দর্য হচ্ছে নিছক সাজসজ্জার উপর।
এ কথা মেধাসম্পন্ন পুরুষই বিশ্বাস করে।

فی الحقیقت قحبۂ بے غیرت اند | روز ہر ایک شوہر شاں دیگر اند

ফিল হাক্বী-ক্বত ক্বাহবায়ে বে- গায়রত আন্দ | রো-য হার এ-ক শওহারে শা-ঁ দী-গর আন্দ

বাস্তবিকপক্ষে তারা হচ্ছে নিছক লজ্জাহীনা নারী।
তাদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন স্বামী থাকে।

نزد شاں ہر قوم یکساں آمدند | طالبان خرم وآسائش اند

নযদে শা-ঁ হার ক্বওমে ইয়েকসা-ঁ আ-মদন্দ | ত্বা-লেবা-নে খোররম ও আ-সা-ইশ আন্দ

তাদের নিকট প্রত্যেক জাতিই এক সমান।
তারা শুধু আরাম-আয়েশই খুঁজে বেড়ায়।

واقعہ ایں چنیں از چشم دید | شیربنگالہ ازاں دادہ نوید

ওয়া-ক্বি'আহ্ ঈ-ঁ চুনী-ঁ আয চশমে দী-দ | শে-রে বাঙ্গা-লাহ্ আযা-ঁ দা-দাহ্ নাভী-দ

এ ধরনের ঘটনা হচ্ছে চোখদেখা।
শেরে বাংলা তা থেকেই খবর দিচ্ছে।

در صفت شہر سبز ملقب باسلام آباد معروف بہ چاٹگام مقام دوازدہ
اولیائے کرام وفاضلان ذی احتشام ومشائخ عظام عمرہا اللہ تعالی
الی یوم القیام آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضوان
اللہ تعالی علیہم اجمعین

রদ্দে লা-মাযহাবিয়্যত / তরকে তাক্বলীদ এবং সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ

বেরলভী মাসলাকের কেউ সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করেন যে, সাইয়িদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ'র মাধ্যমে ভারতে 'তরকে তাক্বলীদ এবং লা-মাযহাবিয়্যত' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাইয়িদ সাহেব একজিন সূফী, তরীকতপন্থী বরং একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম ছিলেন বিধায় উনাদের অভিযোগটি যদিও টোটাল হাস্যকর, তথাপি এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোকপাত করতে চাই।

এ.কে. আজাদ কাদেরী নামক জনৈক জাহিল বেরলভী মুফতীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে ওয়াহাবী প্রমাণ করতে যেয়ে সেদিন 'মাওজে কাওছার'[179] নামক কিতাব থেকে দলীল দিতে দেখলাম। লেখক শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম সম্ভবত লা-মাযহাবী। আমি এই কিতাব থেকেই একটি দলীল দিচ্ছি,

এই কিতাবের ৬১ পৃষ্ঠায় 'মাসলাকে ওয়ালিউল্লাহি আওর ওয়াহাবিয়্যত' অধ্যায়ে আলোচনার এক পর্যায়ে ৬২ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

مسائل کی تشریح کے لیے افغان علماء کو بلایا اور شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی قابلیت سے مسئلہ عدم وجوب تقلید کی حمایات کی ، اس وقت شاہ صاحب نے جو راے دی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے فرمایا کہ

'یہ وقت ترک تقلید کا نہیں، ہمیں اس وقت کفار سے جہاد کرنا ہے ، تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں ، اس جھگڑے سے – جس کی بنا ایک فروعی اختلاف

179 শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, *মাওজে কাওছার,* লাহোর: ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৭৫, পৃ. ৬১

سنت یا مستحب ہے – ہمارا اصل کام ہجرت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جائے گا'

'আফগান উলামায়ে কেরামের সামনে শাহ ইসমাইল সাহেব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাকলীদ ওয়াজিব নয়, এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। ঐ সময় শাহ সাহেব[180] যে রায় দিয়েছিলেন তা 'আবে যর' দিয়ে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেন,

'ইয়ে ওয়াক্ত তরকে তাকলীদ কা নেহী, হামে ইস ওয়াক্ত কুফফার ছে জেহাদ করনা হায়, তাক্বলীদ কা ঝগড়া উঠা কর আপনে আনদর তাফরেকা ঢালনা বেহতর নেহী, ইস ঝগড়ে ছে - জিস্কি বিনা এক ফুরুঈ ইখতেলাফে সুন্নাত ইয়া মুস্তাহাব হায়- হামারা আসল কাম হিজরত আওর জেহাদ কা যো ফরজে আইন হায় ফউত হো জায়েগা'।[181]

অর্থাত, 'এটা তরকে তাকলীদের সময় নয় (তাকলীদ নিয়ে ঝগড়া করার সময় নয়), আমাদেরকে এখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হবে, তাকলীদের ঝগড়া শুরু করে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ভাল নয়, এই ঝগড়ার কারণে - যার বুনিয়াদ ফুরুঈ ইখতেলাফে সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব – আমাদের আসল কাজ হিজরত এবং জেহাদ - যা ফরজে আইন – ব্যাহত হবে'।

একজন কমান্ডার ইন চীফ'র বক্তব্য এমনই হওয়া উচিৎ।

একথা সর্বজন বিদিত যে, লা-মাযহাবী সালাফীরাই ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী। যদিও পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাম পরিবর্তন করে তারা হয়েছে

১৮০ সাইয়িদ আহমদ শহীদ

১৮১ শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬২

আহলে হাদীস। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বড় বড় আলিমও গত হয়েছেন। তারা ছিল বৃটিশমিত্র। বৃটিশভারতকে তারাও দারুল ইসলাম ঘোষণা করেছিল। তাদের কিছুলোক তাদের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে বৃটিশ-বিরোধী জেহাদ আন্দোলনে শরীক হয়েছিল এবং সাইয়িদ সাহেবের হাতে জেহাদের বায়আতও করেছিল। ইসমাইল দেহলভীকে পেয়ে তারা আরো উজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু সাইয়িদ সাহেব সুযোগ তো দিলেনই না বরং আনওয়ারুল বারী শরহে বুখারীতে উল্লেখিত একটি বর্ণনায় দেখা যায়, সাইয়িদ আহমাদ বুঝিয়ে দিলেন ইসমাইল দেহলভীকে যে, রাফউল ইয়াদাইন করাই শুধু সুন্নাত নয়, রাফউল ইয়াদাইন না করাও সুন্নাত। ইসমাইল দেহলভী মনে করতেন, রাফউল ইয়াদাইন না করার কারণে একটি সুন্নাত মারা যাচ্ছে। এই কারণে সুন্নাত জিন্দা করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি রিসালাও লিখেছিলেন।

জেহাদের ময়দান রাফউল ইয়াদাইন নিয়ে ঝগড়া করার ময়দান নয়, সাইয়িদ সাহেব এই শিক্ষাই দিলেন আমাদেরকে। অন্যদিকে ইসমাইল দেহলভীকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়েও দিলেন। মনে রাখা উচিৎ বৃটিশ-বিরোধী জেহাদ আন্দোলন কোন মাযহাবী আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল জাতীয় একটি আন্দোলন। জেহাদে অংশগ্রহণ ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত।

আনওয়ারুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী খন্ড ১৫, ৩২২ পৃষ্ঠায় “রাফয়ে ইয়াদাইন কো বেদআত কিস হানাফী নে লেকহা” শিরোনামে এই মাসআলায় ইসমাইল দেহলভী’র রুজু’ করার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। দেখুন,

ہمارے حضرات میں سے آخری دور میں مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے رفع یدین شروع کیا تھا ، اور ایک رسالہ بھی اس بارے میں لکھا تھا ، ان کو خیال ہو گیا تھا کہ یہ سنت مردہ ہو گئی ہے ، اس کو زندہ کرنے میں سو شہیدوں کا ثواب ملے گا ،

حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ سے فرمایا 'ان سمجھا دیں کہ رفع و ترک دونوں ہی سنت ہیں ، اور دونوں ہی امت میں معمول بہا ہیں ، ان میں سے کسی کو مردہ سنت خیال کر کے اس کو جاری کرنا غلط ہے '، تو اس کے بعد مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا اور رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا ، مولانا کرامت علی جونپوری نے ذخیرۃ کرامت ص 2/224 میں اس طرح نقل کیا ہے کہ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت سید احمد صاحب قدس سرہ کا سمجھانے پر رجوع کیا تھا

অর্থাৎ (একটি বর্ণনা মতে) শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ’র বুঝানোতে শাহ ইসমাঈল দেহলভী রুজু করেন। (অপর বর্ণনায়) জখিরায়ে কারামতের ২য় খণ্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায় আছে, নিজ মুর্শিদ সায়্যিদ আহমদ শহিদ কুদ্দিসা সিররুহু বুঝানোর পর মাওলানা ইসমাঈল শহিদ র. রুজু করেছিলেন।[182]

হযরতের কিতাব নিয়েও প্রতারণা: সাইয়িদ আহমাদ বেরলভীকে কেবল বুজুর্গ মানলে কেউ ওয়াহাবী হবে না

মৌলবি আশরাফুজ্জামান তার বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘ঠিক এ বিষয়টাই আ'লা হযরতের দরবারে ইস্তিফতা (ফাতওয়া তলব) করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে ওলী-বুযুর্গ মনে করে এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলা হবে? (মানে এ লোকটাকে ওয়াহাবী বলা যাবে কিনা? জবাবে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন এ লোক যদি “সিরাতে মুস্তাকীম’-এ বর্ণিত বাতিল এবং কুফরি বক্তব্যগুলোকে

[182] মাওলানা সাইয়িদ আহমদ রেজা সাহেব বিজনূরী (ইফাদাত ইমামু আসর আল্লামা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশমিরী), *আনওয়ারুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী*, পাকিস্তান: এদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া, ১৪২৫ হি., খ. ১৫, পৃ. ৩২২

বাতিল এবং কুফরি বলেই জানে এবং মানে তাহলে সে ওয়াহাবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই কেবল (শেকল-সেরত-দেখে) সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে বুযুর্গ বললেই ওকে ওয়াহাবী বলা যাবে না। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে ওয়াহাবী বলেই জানতেন'। এখানেও প্রতারণার আশ্রয় নিলেন মৌলবি আশরাফুজ্জামান। আসুন দেখি মূল কিতাবে কি লিখা আছে,

"اگر صراط مستقیم کے کلمات باطلہ کو باطلہ ، کفریہ کو کفریہ ، اسمٰعیل دھلوی کو گمراہ ، بد دین جانتا ہے، وہابیت سے جدا ہے تو سید احمد کو صرف بزرگ جاننے سے وہابی نہ ہوگا"

'যদি সিরাতে মুস্তাকিমের বাতিল কথাকে বাতিল, কুফরীকে কুফরী, ইসমাঈল দেহলভীকে গোমরাহ, বদ-দ্বীন জানে, ওয়াহাবিয়্যত থেকে আলাদা থাকে তাহলে সাইয়িদ আহমাদকে কেবলমাত্র বুজুর্গ জানার কারণে কেউ ওহাবী হবে না'।[183]

সহজ কথায় যার অর্থ দাড়ায় সাইয়িদ আহমাদ শহীদ অন্তত ওয়াহাবী নন। সকলের জানা কথা, একজন সাইয়িদ কোন মুল্লা-মৌলবির সার্টিফিকেটের মুখাপেক্ষী নন, কোন গোস্তাখে রাসূলের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন সাইয়িদদের নেই।

كَفَاكُمْ بَنِيْ الزَّهْرَاءِ فَخْرًا إِذَا مَا قِيْلَ جَدُّكُمُ الرَّسُوْلُ

'হে ফাতিমা যাহ্‌রার সন্তানেরা, আপনাদের নানা স্বয়ং রাসুল'- এটুকু বলাই আপনাদের গর্বের জন্য যথেষ্ট।'

[183] আহমদ রিজা খান বেরলভি, *ফতোয়ায়ে রেযভিয়া,* পাকিস্তান: রেজা ফাউন্ডেশন, ২০০৫, খ. ২৯, পৃ. ২৩৬, প্রশ্ন ৯১

মাওলানা শাহ কারামাত আলী জৌনপুরী প্রসঙ্গ

মৌলবি আহমাদ রেযা খান সাহেব মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ'র মিফতাহুল জান্নাত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

"اور مفتاح الجنۃ تو وھابیہ کے ہاتھ میں رہی جس میں بہت کچھ اصلاح ہوئی"[184]

'আওর মিফতাহুল জান্নাত তো ওয়াহাবিয়্যাহ কে হাত মে রাহী জিস মে বহুত কুচ ইসলাহ হুয়ী'

অর্থাৎ 'আর মিফতাহুল জান্নাত তো ওয়হাবীদের হাতে ছিল, অনেক কিছু ইসলাহ হয়েছে' মানে পরিবর্তন হয়েছে।

মৌলবি আহমাদ রেজা খান ছাহেবের এই কথা থেকে কেবল এই কথাই প্রমাণ হয় না যে, মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের কিতাবে তাহরীফ হয়েছে, একই সাথে এই কথাও প্রমাণ হয় যে, মাওলানা শাহ কারামাত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ ওয়াহাবী নন।

গোস্তাখে রাসূল যাদের ইমাম

মৌলবি আশরাফুজ্জামান বলেন,

'ফার্মে পালিত এ মোল্লা হয়ত জানে না যে, চট্টগ্রামসহ পাক-বাংলা-ভারতে এমন হাযারো দরবার ও পীরানে রয়েছেন যাদের সিলসিলায় কোন গোস্তাখে রাসূল নাই'।[185]

মৌলবি আশরাফুজ্জামানের ইমাম মৌলবি আহমাদ রেযা খান একজন প্রমাণিত গোস্তাখে রাসূল, গোস্তাখে আহলে বায়ত। দুই ফাজিলের গোস্তাখী বইটি মৌলবির হাতে পৌঁছে গিয়েছে। সিরাজনগরের গালিবাজ মুরব্বির হাতে তো আমরাই পৌছে দিয়েছি।

[184] প্রাগুক্ত, পাকিস্তান: রেজা ফাউন্ডেশন, তাবি, খ. ২৯, পৃ. ৬০–৬১

[১৮৫] আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৩

পরিশিষ্ঠ

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহ, শাহ আব্দুল আজীজ রাহিমাহুল্লাহ এবং শাহ ওয়ালি উল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ'র বিরুদ্ধে আনীত ওয়াহাবিয়্যতের অভিযোগ একটি বৃটিশ প্রপাগান্ডা, এবং বৃটিশের পরিকল্পনায় কিছু ইসলামবিদ্বেষী অমুসলিম ও বৃটিশের দালাল কিছু নামধারী মুসলিম লেখকের মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। বৃটিশের স্বার্থরক্ষা এবং মুসলিম উম্মাহকে বিভক্তির অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত করে ভারত শাসন ও শোষণ করাই ছিল মূল কারণ। মূলত সম্মানিত তিন ইমামের কেউই ওহাবী ছিলেন না বরং তাঁরা সকলেই ছিলেন ওহাবীবাদ ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।

বৃটিশের আদালতে স্বাধীনতাকামী সবাই ছিল তাদের দৃষ্টিতে ওহাবী- এই কথাটিও প্রমাণিত হল। মৌলবি আহমাদ রেযা খানের পিতা এবং দাদা বৃটিশ-বিরোধী ছিলেন, বৃটিশের ফতোয়ায় তারাও ওহাবীই ছিলেন। অপরদিকে মৌলবি আশরাফুজ্জামান যা প্রমাণ করলেন, তাতে পুরা বেরলভী মাসলাকটাই ওহাবী সাব্যস্ত হল।

মৌলবি আশরাফুজ্জামান আরো যা প্রমাণ করলেনঃ

মৌলবি আশরাফুজ্জামান সাইয়িদ আহমাদ শহীদ রাহিমাহুল্লাহকে ওহাবীবাদের আমদানীকারক প্রমাণ করতে গিয়ে প্রমাণ করলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আব্দুল আজীজ উভয়ই ওহাবী ছিলেন। যার মানে তাদের ইমাম মৌলবি আহমাদ রেযা খান স্বয়ং ওহাবী ছিলেন!! মৌলবি আশরাফুজ্জামান তাদের আরো দুটি দাবীকে ভুয়া প্রমাণ করলেন। প্রমাণ উপস্থাপনে আশরাফুজ্জামানের ঐতিহাসিক বিভিন্ন খেয়ানতের পর যা রয়েছে তা থেকে সামান্য আমরা উল্লেখ করছি।

বৃটিশ-মিত্র নয়, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ বৃটিশ বিরুধী ছিলেনঃ

দলীল ৮ এ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

"বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামিক পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন রূপে ওয়াহাবি আন্দোলনের সুচনা হয়। ভারতে হাজি ওয়ালিউল্লাহ এর নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হলেও প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন "সৈয়দ আহমদ।'

দলীল ১৩ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

"তাছাড়া সৈয়দ আহমদ শহীদ সূচিত এবং তার পরবর্তী ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে বাংলার মুসলমানদেরও যে ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।'

দলীল ১৫ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

'তারা সাধারণের কাছে প্রচার করেন যে হিন্দুস্থান এখন দারুল হারাব (অর্থাৎ কাফিরদের দেশ) সুতরাং সকল ভাল মোহাম্মদীর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে'।

'ভারতের দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে দারউল ইসলামের বানী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টার করুণ পরিণতি ভারতের অন্যান্যদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেনি। তার শিক্ষা সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষুব্দ করেছে। সৈয়দ আহমদ ধর্ম সংস্কারের প্রচারকের থেকে অধিক কিছু হয়ে গেলেন। ১৮৩১ সালের গ্রীস্মকালে তার শহীদ হওয়ার সংবাদ দেশের সকল স্থানের মুসলমানরা ভীতির সাথে গ্রহণ করল। বাংলায় এটি একটি উত্তেজক প্রণোদনা যা ওয়াহহাবি বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল'।

দলীল ১৬ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

'তরিকা-ই মুহাম্মাদিয়া বা তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন"---
"তথাকথিত ওহাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দিতে

এ উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবী মুসলমানদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কারো কারো মতে ভারতে জনসাধারণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত সর্বপ্রথম আন্দোলন ওয়াহাবিদেরই'।

দলীল ১৭ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

'উপমহাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেলভি এবং বাংলায় তার শিষ্য মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির। একজন শিখদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে শহীদ হন এবং অপরজন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন'।

দলীল ১৮ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

"পিন্ডারী কৃষক সৈন্য দলের সেনাপতি রূপে তিনি বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়'।

দলীল ১৮ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

"ইংরেজগণ তাদের শ্রেষ্ঠ ও গর্বের উপনিবেশ সম্পদশালী ভারতবর্ষে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের সালাফী আন্দোলনের প্রভাব ও প্রসার উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে | বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের বহুলোক মুসলিম ধর্ম প্রচারক আহমাদ বিন ইরফান (আহমদ বাচিলী) ও তার অনুসারীগণের হাতে এই সালাফী দাওয়াত গ্রহণ করে'।

পাঠান সুন্নীদের বিরুদ্ধে নয়, শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ হোন সাইয়িদ আহমাদ শহীদঃ

দলীল ১০ এ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

".১৮৩১খিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সেনাপতি শের সিং এর কাছে সৈয়দ আহমদের বাহিনী পরাজিত হয়। তিনি নিহত হন"

দলীল ১৪ মৌলবি আশরাফুজ্জামান লিখেন,

'তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান'।

'ওরা ছিল ধোঁকাবাজ'

আশরাফুজ্জামানদের সুন্নী-হানাফীরা ছিল ধোঁকাবাজ। আশরাফুজ্জামান স্যার সৈয়দ আহমদের উদ্বৃতি দিয়ে এই কথাই স্বীকার করেছেন। দেখুন তার দলীল ২০। ব্রাকেটের ভিতরের কথাগুলো মৌলবি আশরাফুজ্জামানের।

'১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবিরা (সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির বাহিনী) (সীমান্তের) পাহাড়িদের এলাকায় অবস্থান নিল। তারা চাইল (যৌথভাবে) শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব আর (মরলে তো) শহীদ হব কিন্তু যেহেতু পাহাড়ি (সুন্নী হানাফি) সম্প্রদায়গুলো ওয়াহাবিদের আকীদার বিপরীত ছিল সেহেতু এই ওয়াহাবিরা পাহাড়ীদেরকে তাদের আকীদা মানতে রাজী করাতে পারেনি। অবশ্য যেহেতু তারা শিখদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল তাই সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধ করতে সম্মত হল এবং একত্রিতভাবে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করল; কিন্তু যেহেতু তারা আকিদা বিরোধীদের ব্যাপারে কঠোর ছিল। তাই (ওয়াহাবিদের দূরভিসন্ধী বুঝতে পেরে বাধ্য হয়ে) তাদের ধোকা দিয়ে শিখদের সাথে মিলে মৌ: ইসমাইল ও সৈয়দ আহমদকে শহীদ (হত্যা) করল।'

কে ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ?

নিজের বিভিন্ন উদ্যোগ ও বৃটিশদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষের জাতীয় নেতায় পরিণত হন। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন তাঁকে রাজকীয় আইনসভায় মনোনয়ন দান করেন। ১৮৮৭ সালে লর্ড ডাফরিন তাঁকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৮৮৮ সালে বৃটিশ সরকার তার 'নাইটহুড' প্রদান

করে। এর পর থেকে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ হিসাবে পরিচিত হতে থাকেন।

আশরাফুজ্জামানের থলের বিড়াল বেরিয়ে গেল!

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে আশরাফুজ্জামানদের মিল আসলে এখানেই। বৃটিশের পৃষ্টপোষকতা এবং বৃটিশ-বিরোধীদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু অবশেষে মুখ ঢাকতে নুনু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার মত ঘটনাই ঘটল। আশরাফুজ্জামান তোমাকে ধন্যবাদ। এটাকেও একটি কারামত হিসাবে প্রচার করা হতে পারে কোন একটি 'আলা হযরত' কনফারেন্সে!

গ্রন্থপঞ্জী

আরবি

১. السيد أبو الحسن علي الندوي ، ترجمة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مجدد القرن الثالث عشر ، الطبعة الثانية 1420 ه

২. السيد أبو الحسن علي الندوي ، إذا هبت ريح الإيمان / مؤسسة الرسالة

৩. السيد أبو الحسن علي الندوي ، الإمام الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف

৪. أبو عبد الله محمد عين الهدى ، الخطبة الحنفية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 2021 م

৫. جامع الأحاديث مع إفادات مجدد أعظم إمام أحمد رضا ، ج 1 مقدمة

৬. الاقتصاد في مسائل الجهاد لأبي سعيد محمد حسين لاهوري

৭. إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام / الشيخ أحمد رضا خان دعوت إسلامي

৮. الدكتور عبد المنعم النمر ، تاريخ الإسلامي في الهند ، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان 1981م

৯. محمد الفاضل بن علي اللافي ، دراسات عقائد نصرانية: منهجية ابن تيمية ورحمة الله الهندي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، أمريكا 2007م

ইংরেজি

১০. Francis Robinson, The Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia. FEROZSONS (Pvt.) LTD. LAHORE-RAWALPINDI-KARACHI. 2002

১১. Francis Robinson, *Separatism Among Indian Muslims, the politics of the United Provinces, Muslims 1860 – 1923*, Appendix III.

১২. Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics*, Delhi: Renaissance Publishing House, 1985

১৩. W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, London: Trubner and Company, 1872

১৪. Muhammad Ismail, De*velopment of Sufism in Bengal*, PhD Thesis, Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University Aligarh (India), 1989

১৫. Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1960

১৬. Dr. Muin Uddin Ahmad Khan, Selections From Bengal Government Records on Wahhabi Trials, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961(1st ed.)

১৭. R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement*. Vol. III

১৮. Shabnam Begum, *Bengal's Contribution to Islamic Studies During the 18th Century*, PhD Thesis, Department of Islamic Studies, Aligarh muslim university, Aligarh, India, 1994

১৯. Islamtimes24.com, ৬ মে ২০১৯

উর্দু

২০. মাওলানা সাইয়িদ আহমদ রেজা সাহেব বিজনূরী (ইফাদাত ইমামু আসর আল্লামা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশমিরী), *আনওয়ারুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী*, পাকিস্তান: এদারায়ে তালিফাতে আশরাফিয়া, ১৪২৫ হি.

২১. আহমদ রিজা খান বেরলভি, *ফতোয়ায়ে রেযভিয়া*, পাকিস্তান: রেজা ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.

২২. আহমদ রিজা খান বেরলভি, *আহকামে শরীয়ত*

২৩. আবুল হাসান আলী নদভী, *তাহকীক ও ইনসাফ কি আদালত মে এক মুসলিহ কা মুকাদ্দামাহ,* লাহোর: সায়্যিদ আহমদ শহিদ একাডেমি, ১৯৭৯ খ্রি.

২৪. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, *কারোয়ানে ঈমান ও আজীমত*, লাহোর: সায়্যিদ আহমদ শহীদ একাডেমি, ১৯৮০ খ্রি.

২৫. মৌলবি আহমাদ ইয়ারখান নঈমী, *তাফসীরে নূরুল ইরফান*

২৬. মাওলানা আহমাদ রেজা খান, *ফতোয়ায়ে রেজভীয়া*, লাহোর: রেজা ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি. (আলা হযরত নেটওয়ার্ক)

২৭. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক*, লাহোর: সিন্ধ সাগর একাডেমী, ২০০৮ খ্রি.
২৮. মৌলবি ইক্তেদার নঈমী, *তানকীদাত আলা মাতৃবূআত*, পাকিস্তান: নঈমি কুতুবখানা, তাবি
২৯. গোলাম রাসূল মেহের, *তাহরীকে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ*, মুযাফফরনগর: ইমরান কম্পিউটার্স, ২০০৮ খ্রি.
৩০. গোলাম রাসূল মেহের, *জামাআতে মুজাহিদীন*, লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, তাবি
৩১. মাসঊদ আলম নদভী, *হিন্দুস্তান কি পহেলি ইসলামী তাকরীক*, লাহোর: মাকতাবায়ে চেরাগে ইসলাম, ১৯৮৯ খ্রি.
৩২. মাওলানা মুহাম্মাদ উমর সিদ্দীকী (বেরলভী), *মিকয়াসে হানাফিয়াত*, লাহোর: আল মিকয়াস পাবলিশার্স, ১৪২৬ হি., ২৮তম সংস্করণ
৩৩. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসুদ আহমদ, *হায়াতে মাওলানা আহমাদ রিজা খান*
৩৪. শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম, *মাওজে কাওছার,* লাহোর: ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া, ১৯৭৫ খ্রি.
৩৫. আনওয়ারে রেযা
৩৬. ইয়াদে আলা হযরত

বাংলা

৩৭. আজিজুল হক, *দিওয়ানে আজীজ* (অনু: মাওলানা আব্দুল মান্নান), চট্টগ্রাম: সাগরিকা প্রিন্টার্স, ২০১২ খ্রি.
৩৮. আবূ জাফর ফুরফুরাবী, ওয়াজাইফে তরীকত, ভারত: ফুরফুরা শরিফ
৩৯. আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ, *চারি তরীকার শাজরা, আদাবে মুর্শিদ ও ওজীফা,* নেছারাবাদ: ছারছীনা দরবার শরীফ, তাবি
৪০. আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী, মুখোসের অন্তরালে
৪১.এ.কে.এম নাজির আহমদ, *উপমহাদেশের অতীত রাজনীতির খণ্ডচিত্র,* ঢাকা: দি ইনেডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ২০১৩ খ্রি.
৪২.এম.আর.আখতার মুকুল, *কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪ খ্রি.
৪৩. প্রফেসর ড. আব্দুল করীম, *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রি.
৪৪. আব্দুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১ খ্রি.
৪৫. মৌলবি আহমাদ ইয়ারখান নঈমী, *তাফসীরে নূরুল ইরফান*
৪৬. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *ইতিহাসের ইতিহাস*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০২১ খ্রি.
৪৭. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, ঢাকা: মুন্সী মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী, ২০১০ খ্রি.
৪৮. জুলফিকার আহমাদ কিসমতি, *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা,* ঢাকা: প্রফেসরস বুক কর্নার, ২০০০ খ্রি.
৪৯. ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান* (অনু: এম. আনিসুজ্জামান), ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, তাবি
৫০. ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১ খ্রি.
৫১.মুহাম্মদ আইনুল হুদা, *দুই ফাজিলের গোস্তাখী*, ঢাকা: আহলুস সুন্নাহ মিডিয়া, ২০২১ খ্রি.
৫২. মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ, *উপমহাদেশে আলিম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য*(অনু: মাওলানা মুশতাক আহমদ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.
৫৩. মুহাম্মাদ সাইফুল হক সিরাজী, *মীরসরাইয়ের সুফী-সাধক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব*
৫৪. মুহাম্মাদ মুবারক আলী রাহমানী, সীরাতে ওয়সী
৫৫. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮ খ্রি.
৫৬. ড. মুহাম্মাদ ইনাম উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.
৫৭. রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, *নজদী পরিচয়*, ঢাকা: রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯০
৫৮. রিদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, *ওহাবী পরিচয়,* ঢাকা: রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী
৫৯. আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, *ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও হযরত আবু বকর সিদ্দীকী রহ'র বিস্তারিত জীবনী, বশিরহাট*: নবনূর প্রেস, ২00৫
৬০. আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি ফুরফুরাবী, *কারামতে আহমাদিয়া* (মুজাদ্দিদে জামান আল্লামা আবু বকর সিদ্দীক ফুরফুরাবীর অনুমোদনে), বশিরহাট: নবনূর প্রেস, তাবি
৬১.আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, *কারামাতে আহমাদিয়া বা একখানা বিজ্ঞাপন রদ, বশিরহাট*: নবনূর প্রেস, তাবি
৬২.আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটি, *বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী*, বশিরহাট: নবনূর প্রেস, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৬৩. সত্যেন সেন, *বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬ খ্রি.

৬৪. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ঈজা হাব্বাত রীহুল ঈমান*, কুয়েত: দারুল কলম, ১৯৭৪ খ্রি.

৬৫. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ঈমান যখন জাগলো,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.,

৬৬.সাইয়্যিদ আবূল হাসান আলী নদভী, *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান* (অনু: অধ্যাপক আ ফ ম খালিদ হোসেন), চট্টগ্রাম: সেন্টার ফর রিসার্চ অন কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪ খ্রি.

৬৭. সিদ্দিক আহমাদ খান, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল খালেক রাহিমাহুল্লাহর জীবন চরিত

৬৮. সাইফুল্লাহ আল-হানাফী, *হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সহ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন*, সিলেট: শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.

৬৯.শাহ সূফী সাইয়িদ আহমাদুল্লাহ, *আজিমপুর দায়রা শরীফ*, ঢাকা: আজিমপুর দায়রা শরিফ

৭০. শেখ জেবুল আমিন দুলাল, *চেতনার বালাকোট*, ঢাকা: প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ২০০৩

৭১.সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রি.

৭২. সিবগাতুল্লাহ সিদ্দীকী, তরীকতে তাসাউফ, ভারত: ফুরফুরা শরিফ

লেখকের অন্যান্য বই

1. প্রিয় নবীজীর প্রিয় দোয়া
2. সহিহ হাদিসে তাবাররুকাতে মুহাম্মাদী
3. সহিহ হাদিসে তারাবিহ'র সালাত
4. সহিহ হাদিসে শবে বরাত
5. দুই ফাজিলের গোস্তাখী
6. তাজিমী সিজদা ও কদমবুছি
7. ফিতনায়ে আশরাফুজ্জামান, ওহাবী এবার মৌলবি আহমাদ রেযা খান
8. আল-খুতবাতুল হানাফিয়্যাহ الخطبة الحنفية (আরবী) ২২২ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুব আল-ইল্মিয়্যাহ, লেবানন থেকে প্রকাশিত।
   http://www.al-ilmiyah.com/details?id=978-2-7451-9865-5
9. রক্তে যাদের শিরকের ভাইরাস

10. জিয়ারতে রাহমাতাল্লিল আলামীন (ষ্টক আউট)
11. কানা দাজ্জালের আবির্ভাব (ষ্টক আউট)
12. শুহাদায়ে কারবালা (ষ্টক আউট)
13. মাওলিদু রাসুলিল্লাহ, হাফিজ ইবনু কাসীর। (ষ্টক আউট)
14. মীলাদে মোস্তফা (সম্পাদনা) (ষ্টক আউট)
15. Muhammad PBUH in the Bible (ষ্টক আউট)
16. Scientific Facts in the Quran
17. Aqida e Tahabiyyah (ইংরেজী অনুবাদ)
18. Al-Fiqhul Akbar (ইংরেজী অনুবাদ)
19. Mawlid Barzanzi (ইংরেজী অনুবাদ)
20. The Rights
21. The Tajweed Book One

কিছু অপ্রকাশিত বই

22. রাসূলের মুচকি হাসি
23. রাসূলের কান্না
24. সুন্নাতী দাম্পত্য জীবন
25. আমেরিকায় ইসলামের ইতিহাস
26. ইসরাইল রাষ্ট্রের পতন
27. التحفة اللطيفية في الخطبة الحنفية
28. أبو طالب ومسألة الإيمان في الرد على الشيخ أحمد رضا خان
29. القول اللبيب في إيمان آباء النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
30. من التراب أو النور خُلِقَ نبيٌّ خالق النور
31. الأدلة الحنفية
32. الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد
33. البريلوية فرقة باطلة (অসম্পূর্ণ)
34. الاحتفال بالمولد النبوي بين الإفراط السلفي الديوبندي والتفريط البريلوي
35. التبركات المحدية في السنة الصحيحة
36. القول الفصيح في صلاة التراويح
37. ليلة النصف من شعبان ليلة الرحمة والغفران
38. حسن البيان التحية والتعظيم والتعبد في السنة والقرآن
39. تقبيل القدمين لأهل الفضل والعين في شريعة الثقلين
40. الغلو في التكفير